তরবিয়তে আওলাদ

ইসলামের দৃষ্টিতে

সন্তান প্রতিপালন

মূল উর্দূঃ

হাকীমুল উম্মত মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মওলানা

আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

অনুবাদঃ

মোহাম্মদ খালেদ

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

সন্তান প্রতিপালনে কষ্ট স্বীকার এবং দুধ পান করানোর ফজিলত

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ নারীগণ গর্ভধারণ হইতে শুরু করিয়া সন্তানপ্রসব এবং তৎপরবর্তী দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত (যেই কষ্ট করে উহাতে) সে ইসলামী সীমান্তের প্রহরীর মত ছাওয়াব লাভ করে, (সীমান্তের প্রহরী প্রতিটি মুহূর্তে সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকে)। নারী যদি ঐ সময়-সীমার মধ্যে ইন্তেকাল করে তবে সে শহীদের বরাবর ছাওয়াব লাভ করিবে।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ নারী যখন সন্তানকে দুধ পান করায় তখন প্রতি ঢোক দুধের বরাবরে সে এইরূপ বিনিময় লাভ করে যেন কোন প্রাণীকে সে জীবন দান করিল। পরে সে যখন সন্তানের দুধ ছাড়ায় তখন ফেরেশতা তাহার কাঁধ স্পর্শ করিয়া (সাবাসী দিয়া) বলে যে, তোমার বিগত জীবনের সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন ভবিষ্যতে যেই গোনাহ করিবে উহা লিপিবদ্ধ করা হইবে। এই গোনাহের অর্থ ছগীরা (ছোট) গোনাহ। তবে ছগীরা গোনাহ্ ক্ষমা হইয়া যাওয়াও কম কথা নহে।

কন্যা-সন্তান প্রতিপালনের ফজিলত

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই ব্যক্তির তিনটি কন্যা-সন্তান হইবে এবং সে তাহাদিগকে এলেম-কালাম, আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে এবং যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবে ও তাহাদের উপর অনুগ্রহ করিবে, সেই ব্যক্তির উপর অবশ্যই জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

ফায়দা ঃ ছেলে-সন্তানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বভাবজাত ও চিরন্তন।

এই কারণেই উহার ফজিলত বর্ণনার বিষয়টি শরীয়ত এতটা গুরুত্ব প্রদান করে নাই। কিন্তু কন্যা-সন্তানকে যেহেতু নিকৃষ্ট মনে করা হইত, এই কারণেই তাহাদের লালন-পালনের ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে।

গর্ভ ধারণের ফজিলত

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই নারী কুমারী অবস্থায়, গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে কিংবা নেফাসের সময় ইন্তেকাল করে সে শাহাদাত প্রাপ্ত হয়।

রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই নারীর হামল পড়িয়া যায়, সে যদি ছাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে তবে ঐ সন্তান পরকালে নিজের মাতাকেও টানিয়া বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবে।

রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই নারীর তিনটি সন্তান ইন্তেকাল করিল এবং ছাওয়াবের আশায় সে ধৈর্যধারণ করিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এক মহিলা ছাহাবী আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! যার দুইটি সন্তান ইন্তেকাল করিল? তিনি এরশাদ করিলেন, দুই জনের ক্ষেত্রেও ঐ একই ছাওয়াব। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, এক ছাহাবী এক সন্তানের মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহারও বহু ছাওয়াবের কথা উল্লেখ করিলেন।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ (নারীদের প্রতি) তোমরা কি ইহাতে রাজী নও যে, (অর্থাৎ রাজী হওয়া উচিত) যখন তোমাদের মধ্যে কেহ নিজের স্বামীর উছিলায় গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে এই পরিমাণ ছাওয়াবের অধিকারী হয়, যেই পরিমাণ ছাওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে আল্লাহর পথের রোজাদার এবং বিনিদ্র রজনীর এবাদতকারী।

আর যখন তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন তাহার শান্তি ও আরামের জন্য যেই সকল ছামান পরপারে মওজুদ করা হয়- সেই সম্পর্কে আকাশ ও মর্তবাসী কোন ধারণাই করিতে পারে না। সন্তান প্রসব হওয়ার পর তাহার স্তন হইতে এমন একটি দুধের ফোটাও বাহির হয় না, যাহার পরিবর্তে কোন নেকী পাওয়া যায় না। আর সন্তানের জন্য যদি তাহার রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, তবে সে আল্লাহর পথে সত্তরটি গোলাম আজাদ করার ছাওয়াব লাভ করিয়া থাকে।

এক মহিলা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। মহিলার একটি সন্তান ছিল তাহার কোলে এবং অপরটি অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতেছিল। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সকল মহিলা প্রথমতঃ গর্ভে সন্তান ধারণ করে, অতঃপর প্রসব করে এবং অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করে। যদি তাহারা স্বামীর মনের সন্তুষ্টি হাসিল করিতে পারিত তবে বেহেশতী হইত।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই বিধবা নারী বিবাহের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এতীম সন্তানদিগকে লালন-পালন করিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে নাই; বরং এতীমদের রক্ষণাবেক্ষণে যেই পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, উহার কারণে তাহার রূপ-লাবণ্য মলীন হইয়া গিয়াছে। এমনকি তাহার এতীম সন্তানগণ হয়ত মরিয়া গিয়াছে, কিংবা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ নারী বেহেশ্‌তে আমার সঙ্গে এত নিকটবর্তী হইবে যেন শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলি।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, বিধবা বিবাহের অতিশয় তাকীদ কোরআন-হাদীসে থাকা সত্ত্বেও এতীম সন্তান পালনার্থে যদি কোন বিধবা দ্বিতীয় বিবাহ না করে তবে তাহার জন্য উহা জায়েজ; বরং উহা বিশেষ ফজিলতের কারণ হইবে। কিন্তু যদি বিনা ওজরে নিছক কুলীনতার দোহাই দিয়া কিংবা হিন্দুয়ানী দেশাচারের খাতিরে দ্বিতীয় বিবাহকে দুষণীয় মনে করে, তবে সে শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে।

সন্তানের গুরুত্ব ও ফজিলত

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা এমন নারী বিবাহ কর যে স্বামীভক্তা হয় ও স্বামীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে এবং সন্তান-জন্মা হয় ও সন্তানদিগকে আদরে-যত্নে প্রতিপালন করে। (যদি বিধবা হয় তবে পূর্বের বিবাহ হইতে আর অবিবাহিতা হইলে তাহার স্বাস্থ্য দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। বংশের অন্যান্য বিবাহিতা মেয়েদের আচার-ব্যবহার দ্বারা এই সকল বিষয় অনুমান করা যায়।) কেননা, সৎ সন্তান বেশী হইলে আমার উম্মত বৃদ্ধি পাইবে এবং কেয়ামতের দিন আমার উম্মত বেশী হওয়ার কারণে অপরাপর উম্মতের সম্মুখে আমি ফখর ও গৌরব করিতে পারিব।

সন্তান অধিক হওয়ারও বিবিধ উপকারিতা রহিয়াছে। কারণ, সন্তান যদি সুসন্তান হয় তবে তাহারা পিতামাতার দরদ যতদূর বুঝে এবং খেদমত করে

ততদূর অন্যের দ্বারা সম্ভব হয় না। মৃত্যুর পর তাহারা পিতামাতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করে এবং ছাওয়াব রেছানী করে। সন্তানের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের মাধ্যমে দ্বীনের আমলসমূহও জারী থাকে এবং ঐগুলির ছাওয়াব পাওয়া যায়। যদি নাবালেগ অবস্থায় সন্তান মারা যায় তবে তাহারা কেয়ামতের দিন পিতার জন্য শাফাআত করিবে। সন্তান যদি বড় হইয়া আলেম, হাফেজ, কারী বা আল্লাহওয়ালা হয়, তবে তাহারাও পিতামাতার শাফাআত করিবে। সবচাইতে বড় উপকারিতা হইল- মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দুনিয়াতেও শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং কেয়ামতের দিনও আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গৌরব করিবেন।

রাসূল (দঃ)-এর সন্তান-প্রীতি

আল্লাহ পাক মাতাপিতার অন্তরে সন্তানের প্রতি এক অনাবিল মোহাব্বত পয়দা করিয়া দিয়াছেন। সন্তানের প্রতি এই ভালবাসা এমনই চিরন্তন যে, যেই সকল পবিত্র সত্ত্বা কেবল আল্লাহ পাকের এশ্‌ক ও মোহাব্বতেই নিবেদিত; তাহারাও সন্তানের মোহাব্বত ও ভালবাসা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই।

স্বয়ং আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান-হোছাইনকে এতটা মোহাব্বত করিতেন যে, একবার তিনি খোৎবারত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, হযরত হাছান-হোছাইন উঠি-পড়ি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মসজিদের দিকেই আসিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি কিছুতেই আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলেন না। খোৎবার মধ্যখানেই মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইলেন। অতঃপর তিনি অবশিষ্ট খোৎবা সম্পন্ন করিলেন।

কিন্তু বর্তমানে যদি কোন শায়েখ ও বুজুর্গ ব্যক্তি এইরূপ আচরণ করেন তবে সাধারণ লোকেরা হয়ত উহাকে তাহার পদমর্যাদা ও শানের খেলাফ আচরণ বলিয়া ধারণা করিবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কোন অসঙ্গত আচরণ নহে, সাধারণ লোকেরা বরং অহংকার ও তাকাব্বুরীকেই আত্মমর্যাদা ও সম্মানের বিষয় মনে করিতেছে।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সন্তান হযরত ইবরাহীমের ইন্তেকালে এমন শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি চোখের পানি ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে সত্যিই আমি মর্মাহত।

মোটকথা, মহৎপ্রাণ ও পবিত্র সত্ত্বাবর্গও আওলাদের মোহাব্বত ও সন্তানের ভালবাসা হইতে মুক্ত ছিলেন না। ইহা আল্লাহ পাকেরই হেকমত যে, তিনি আমাদের অন্তরে সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম মোহাব্বত পয়দা করিয়া দিয়াছেন। পিতামাতার অন্তরে যদি সন্তানের প্রতি এই আবেগ-ভালবাসা ও মোহাব্বত না থাকিত, তবে পিতামাতার পক্ষে সন্তানের হক আদায় এবং তাহাদের প্রতিপালন কোন ক্রমেই সম্ভব হইত না।

সন্তান-প্রীতির কারণ

আল্লাহ পাক মাতাপিতার অন্তরে সন্তানের প্রতি এমন এক দুর্নিবার ও চিরন্তন আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন যে, যেই সন্তানটি মল-মূত্র দ্বারা সর্বদা নিজেকে নোংরা করিয়া রাখে (যেই দুষ্ট শিশুটি মাতাপিতার কোন শাসনই মানিতে চাহে না, হাতের কাছে যাহা পায় উহাই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া একাকার করিয়া ফেলে, আগুন-পানি, ব্যাঘ্র-সর্প কোন কিছুর সঙ্গেই মিতালী করিতে যাহার কোন আপত্তি নাই, নিজের কর্তব্য কর্মে কোন বাধা-বিঘ্ন ও শাসনের মোকাবেলায় 'ক্রন্দন" নামের একমাত্র অস্ত্র দ্বারা যে অনায়াশে সকলকে পরাভূত করিয়া ফেলে) যেই শিশুটি কখনো কাহারো কোন খেদমত তো করেই না; বরং সর্বদা যে অপরের দ্বারাই নিজের যাবতীয় সেবা-যত্ন করাইয়া লয়; এহেন স্বার্থপর শিশুটির প্রতি যদি মানুষের উজাড় করা আবেগ ও ভালবাসার সম্পর্ক না থাকিত, তবে কিছুতেই সে যাবতীয় প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া তাহাকে লালন করিতে পারিত না। শিশুর প্রতিটি আচার-আচরণ দেখিয়াই মনে হয় যেন সে একটি বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কিছুই নহে, অথচ তাহার এই পাগলামী দেখিয়াই মাতাপিতার হৃদয়ে আনন্দের কোন সীমা থাকে না। তাহার শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলিও সর্বদা ক্ষমার চক্ষে দেখা হয়।

আল্লাহ পাকই মানুষের অন্তরে সন্তানের প্রতি এই ভালবাসা পয়দা করিয়া দিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের এই অকৃত্রিম ভালবাসা একান্তই নিজের আপন সন্তানের সহিত সংশ্লিষ্ট। অপর কাহারো সন্তানের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই এই বাস্তব সত্যটি ভালভাবে উপলব্ধি করা যাইবে। দায়িত্ব পালনের তাকীদে পরের সন্তানের সেবা করিলেও আপন সন্তানের সেবায় শত কষ্টের মাঝেও যেই তৃপ্তি অনুভূত হইবে অপরের ক্ষেত্রে হয়ত এই তৃপ্তির স্থলে সৃষ্টি হইবে 'বিরক্তি'।

আল্লাহ পাক মানুষের অন্তরে সন্তানের প্রতি এমন এক দুর্নিবার আকর্ষণ পয়দা করিয়া দিয়াছেন যে, উহার ফলে সে বাধ্য হইয়াই সন্তানের যাবতীয় সেবা-যত্নের আঞ্জাম দিয়া থাকে।

সন্তানের বাসনা

মানুষ নিজের বংশ রক্ষা এবং দুনিয়াতে নিজের নাম জিয়াইয়া রাখার উদ্দেশ্যে সন্তান কামনা করিয়া থাকে। আসলে মানুষের এই ধারণা একেবারেই অমূলক। মানুষের কোন সমাবেশে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে দেখা যাইবে, অনেকেই নিজের পরদাদা ও প্রপিতামহের নাম বলিতে পারিতেছে না। সুতরাং নিজের পরিবারের সন্তানেরাই যদি মাত্র দুই-এক পুরুষ পূর্বের মুরব্বীদের নাম বলিতে না পারে, তবে কেমন করিয়া ইহা আশা করা যায় যে, অপরে উহা চিরদিন স্মরণ রাখিবে? অর্থাৎ দেখা যাইতেছে, সন্তান জন্মিলেই কাহারো নাম চির অক্ষুণ্ন থাকিতেছে না।

ভাই সকল! নাম অক্ষুণ্ন থাকে আল্লাহ পাকের ফরমাবরদারী করিলে। যাহারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়াছে, পৃথিবীতে তাহারাই অক্ষয় হইয়া আছে। কেবল সন্তান হইলেই অক্ষয় হওয়া যায় না, বরং অনেক সময় অযোগ্য সন্তানের কারণে দুর্নামের ভাগীও হইতে হয়। তাছাড়া কাহারো নাম অক্ষুণ্ন থাকিলেই উহাতে কি লাভ হইবে? মানুষের পক্ষে ইহা কাঙ্ক্ষিত বিষয় হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই।

নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত এমনিতেই মানুষের মনে সন্তানের বাসনা হইতে পারে। ইহা কোন নিন্দনীয় বিষয় নহে। কারণ, সন্তানের প্রতি ভালবাসা ও সন্তান কামনা করা ইহা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। মানব-হৃদয়ের এই বাসনা চিরন্তন। এই কারণেই বেহেশ্‌তে যাওয়ার পরও অনেকে সন্তান কামনা করিবে। অথচ সেখানে নিজের নাম অক্ষুণ্ন থাকার বিষয়টি কাহারো কল্পনাতেও আসিবে না। কারণ, জান্নাতে প্রবেশের পর তো মানুষ নিজেই চিরঞ্জীব হইবে। সুতরাং সেখানে অপরের মাধ্যমে নিজের নাম অক্ষুণ্ন রাখার কোন প্রশ্নই আসিবে না। কিন্তু উহার পরও জান্নাতীরা স্বভাবজাত ও মানবিক চাহিদার কারণেই সন্তান কামনা করিবে। এই কারণেই সন্তান কামনা করিতে আমি নিষেধ করি না।

আমার উদ্দেশ্য হইল– সন্তান কামনার এই স্বভাবসুলভ চাহিদার ক্ষেত্রে নারীদিগকে অন্যায়ভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করার দুষ্টব্যাধি হইতে মানুষকে সতর্ক করা। লোকেরা অনেক সময় অন্যায়ভাবেই নারীদেরকে বলিয়া থাকে যে, হতভাগী! তোমার তো কোন সন্তানই হয় না বা ক্রমাগত কেবল মেয়ে-সন্তানই হইতেছে– ইত্যাদি। নিছক এই অজুহাতে নারীদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে অসঙ্গত আচরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ এই বিষয়ে

নারীদের কোন হাত নাই; ইহা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, তিনি যাহা হুকুম করিবেন তাহাই হইবে। দুনিয়াতে বহু বড় বড় রাজা-বাদশাহগণও নিঃসন্তান ছিলেন, সন্তানের জন্য তাহারা বহু ঔষধ-পথ্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হয় নাই।

অনেক সময় ডাক্তারী পরীক্ষার পর দেখা যায়– হয়ত পুরুষের শারীরিক কোন ত্রুটির কারণেই সন্তান হইতেছে না। মোটকথা, সন্তান হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের বিধানই চূড়ান্ত কথা। এই ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার কোন দখল নাই। সুতরাং এই বিষয়ে কাহাকেও অপরাধী মনে করা কিংবা নিজে অসন্তুষ্ট হওয়া ঠিক নহে।

সুসন্তান পরকালে কাজে আসিবে

সন্তান যদি নেককার-পরহেজগার হয় তবে উহা আল্লাহ পাকের বিরাট নেয়মত। এক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ দীর্ঘ দিন যাবৎ অবিবাহিত ছিলেন। তিনি কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী ছিলেন না।

একদিনের ঘটনা ঃ তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন, অতিসত্ত্বর কোন কন্যা আনিয়া হাজির কর, আমি বিবাহ করিব। সেখানে বুজুর্গের এক মুরীদ উপস্থিত ছিল। লোকটি ছিল সরল প্রকৃতির। ঘরে তাহার এক অবিবাহিতা কুমারী কন্যাও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তাহাকে আনিয়া হাজির করিল এবং বুজুর্গ খুশীর সহিত তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের কিছুকাল পর আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তাহাদের একটি সন্তান জন্ম হইল এবং অল্প কিছুদিন পরই সে ইন্তেকাল করিল। এই ঘটনার পর বুজুর্গ স্ত্রীকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এখন তোমার ইচ্ছা, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে যদি তোমার আগ্রহ থাকে, তবে আমি তোমাকে মুক্তি দিতেছি, তুমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার কর। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিতে চাও, তবে এখানেও থাকিতে পার। কিন্তু বুজুর্গের স্পর্শে থাকিবার ফলে তাঁহার স্ত্রীর মন-মানসিকতায়ও অনেক পরিবর্তন আসিয়াছিল। সুতরাং স্বামীর প্রস্তাবের জবাবে সে বলিল, হে স্বামী! (দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে আমার কোন আসক্তি নাই। অতএব) আমি এখানেই পড়িয়া থাকিব। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিপুল উৎসাহে আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন হইলেন।

কিছুদিন পর বুজুর্গের এক শাগরিদ জিজ্ঞাসা করিল, হযরত! আপনার তো

বরাবরই বিবাহের ব্যাপারে অনীহা ছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন তাড়াহুড়া করিয়া কেন বিবাহ করিলেন? জবাবে বুজুর্গ বলিলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখিলাম, হাশরের ময়দান কায়েম হইয়াছে। মানুষ দলে দলে পুলসিরাত অতিক্রম করিতেছে। কিন্তু এক ব্যক্তি খোড়াইয়া খোড়াইয়া অতিকষ্টে পুলসিরাতের উপর চলিতেছিল। এমন সময় কোথা হইতে একটি শিশু আসিয়া লোকটির হাত ধরিয়া দ্রুত পুলসিরাত পার হইয়া গেল। শিশুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে বলা হইল– ইহা তাহার সন্তান। শৈশবেই সে ইন্তেকাল করিয়াছিল। আজ (এই বিপদের দিনে) সে তাহার পিতার পথ প্রদর্শকের কাজ করিতেছে।

এই পর্যন্ত দেখার পরই আমার নিদ্রা টুটিয়া গেল। পরে স্বপ্নে দেখা ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার মনে এইরূপ ধারণা হইল যে, আমি তো সন্তানের এই ফজিলত হইতে বঞ্চিত হইতেছি। এমনও হইতে পারে যে, অবশেষে হয়ত সন্তানের উছিলাতেই আমার নাজাত হইবে। এই কারণেই স্বপ্ন দেখার পরই আমি বিবাহ করি এবং আমার উদ্দেশ্যও সফল হয়।

কু-সন্তান মুসীবতের কারণ হয়

মানুষের জন্য সন্তান হওয়া যেমন নেয়মত, অনুরূপভাবে সন্তান না হওয়াও আল্লাহর নেয়মত। বরং যেই ব্যক্তির আদৌ সন্তান হয় নাই, কিংবা হওয়ার পর মরিয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে তো আরো বেশী শোকর আদায় করা কর্তব্য।

ভাইসকল! আজকাল তো অধিকাংশ সন্তানই আল্লাহর নাফরমান হইতেছে। সুতরাং যার সন্তান হয় নাই, সে আল্লাহর শোকর আদায় করিবে যে, আল্লাহ পাক বহু চিন্তা-ফিকির হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাহার কর্তব্য হইল, সর্বদা নিশ্চিন্তে আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা।

আজকাল বহু অভিভাবক তাহাদের বিপথগামী সন্তানদের লইয়া অন্তহীন পেরেশানীর শিকার হইতেছে। যেমন, মোনাফেকদের সম্পর্কে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

* فلا تعجبك اموالهم و لا اولادهم . انما يريد الله ليعذبهم بها فى الحيوة الدنيا *

অর্থঃ সুতরাং তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হইল এইগুলি দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাহাদিগকে আজাবে নিপতিত রাখা।

বাস্তবিক, অনেকের সন্তানই তাহাদের জানের উপর মুসীবত হইয়া দেখা

দেয়। শৈশবে এই সন্তানের মল-মূত্রের কারণেই নিজের নামাজ-কালাম বরবাদ করা হয়। বড় হওয়ার পর সন্তান দ্বীনদার হউক চাই না হউক, তাহার বিষয়-সম্পদের যোগান দিয়া তাহাকে সংসার জীবনের পথ ধরাইয়া দিতে মাতাপিতাকে নানাহ পেরেশানীর শিকার হইতে হয়। এই ক্ষেত্রে হয়ত হালাল-হারামেরও বাছ-বিছার করা হয় না। এই কারণেই আমি বলি, সন্তান না হওয়াও নেয়মত। যাহাদের সন্তান হয় নাই, আল্লাহ পাক তাহাদের উপর বড়ই রহম করিয়াছেন।

মেয়ে-সন্তান হওয়া ক্ষতিকর নহে

হযরত খিজির (আঃ) একটি বালককে হত্যা করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত যে, উহা নিহত বালক এবং তাহার মাতাপিতা উভয়ের জন্যই কল্যাণকর ছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ঃ ঐ বালক নিহত হওয়ার পর আল্লাহ পাক তাহার মাতাপিতাকে একটি কন্যাসন্তান দান করিলেন। ঐ কন্যার আওলাদের মধ্যেই বহু নবী পয়দা হইয়াছিলেন। এক্ষণে বলুন, হযরত খিজির (আঃ) কর্তৃক ছেলে নিহত হওয়ার পর ঐ মাতাপিতাকে যদি আবারো একটি ছেলেই দেওয়া হইত, আর ছেলেও যদি আগের মতই হইত, তবে এই ছেলে দ্বারা মাতাপিতার এমন কি কল্যাণ সাধন হইত? ইহা আল্লাহ পাকের বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি ছেলের পরিবর্তে তাহাদিগকে একটি মেয়ে দান করিলেন।

সাধারণতঃ মেয়েরা বংশের কলঙ্কের কারণ হয় না। আর তুলনামূলকভাবে মেয়েরাই মাতাপিতার অধিক অনুরাগী ও ফরমাবরদার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বর্তমানে ছেলেরা এমনই উচ্ছৃংখল হইতেছে যে, এমন সন্তান হওয়ার চেয়ে না হওয়াই ভাল। অবশ্য বর্তমানে হযরত খিজির (আঃ) এই ধরনের ছেলেদেরকে আর হত্যা করিতেছেন না বটে, কিন্তু আল্লাহ পাক তো ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগকে জবাই করিতে পারেন। আর সন্তান পয়দা না করা কিংবা জন্ম হওয়ার পর মৃত্যু দান করা ইহাও আল্লাহর পক্ষ হইতে এক প্রকার জবাই করাই বটে।

আল্লাহ পাক যাহাকে ছেলে-মেয়ে কিছুই দান করেন নাই, তাহার জন্য উহাতে নিশ্চই কোন হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। কেননা, বান্দার জন্য কোন্‌টি কল্যাণকর আর কোন্‌টি ক্ষতিকর তাহা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। আজ একজন নিঃসন্তান ব্যক্তি যেইভাবে নিশ্চিন্তে দ্বীনের খেদমত করিতেছে,

তাহার ঘরে সন্তানাদি থাকিলে হয়ত এইভাবে তাহার পক্ষে দ্বীনের খেদমত করা সম্ভব হইত না। কারণ, সন্তানাদির পিছনে মানুষকে প্রতিনিয়তঃ হাজারো চিন্তা-ফিকির ও পেরেশানী উঠাইতে হয়।

সন্তান প্রতিপালনে পেরেশানী

নারীদের জন্য সন্তান প্রতিপালন এক দুর্বিসহ কষ্টের কারণ বটে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে পুরুষদেরও কম কষ্ট করিতে হয় না। শিশু ও প্রসূতির সেবা-যত্নের আয়োজন করিতে তাহাকে প্রচুর অর্থ ও শ্রম দিতে হয়। তাছাড়া শিশুর সেবা-যত্ন করা যে কি এক দুরূহ ব্যাপার তাহা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কাহাকেও বুঝানো যাইবে না। গরম ও ঠাণ্ডার সামান্য ব্যতীক্রমও সে সহ্য করিতে পারিবে না। অহরহ রোগ-ব্যাধির বিবিধ উপসর্গ তাহার লাগিয়াই থাকিবে। কোন কোন সময় সে এমনভাবে কান্না শুরু করিয়া দিবে যে, অতঃপর কোন যুক্তি-তর্ক দ্বারাই তাহার কান্না নিবারণ করা যাইবে না। উপরন্তু সে কি কারণে কান্না করিতেছে উহার কারণ নির্ণয় করাও সম্ভব হয় না। শিশু যেন বোবা প্রাণীর মত, সে তাহার মনের সুখ-দুঃখ কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাও কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই করিতে হয়।

কখনো মনে করা হয় সে পেটের বেদনায় কাঁদিতেছে, সুতরাং পেটের দাওয়াই দেওয়া হয়। কিন্তু পরক্ষণেই যদি তাহাকে কানের দিকে হস্ত সঞ্চালন করিতে দেখা যায়, তখন হয়ত মনে করা হয়, আসলে সে কানের পীড়াতেই কষ্ট পাইতেছে। তখন সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বে গৃহীত ব্যবস্থা বাতিল করিয়া নূতন ঔষধ প্রয়োগ করা হয়- ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন সময় এমন অবস্থাও হয় যে, কোন লক্ষণাদি দ্বারাও কিছুই অনুমান করা যায় না। অবশেষে হয়ত রোগ নির্ণয়ের জন্য কোন বড় ডাক্তার ডাকাইতে হয়।

মোটকথা, ঐ অর্ধহাত শিশুটির সেবা-যত্নের জন্যই অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এই অবর্ণনীয় পেরেশানীর কোন এক পর্যায়ে মানুষ হয়ত মনের অজান্তেই বলিয়া উঠে- প্রথম সন্তানের আগমনই যেন আমাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আমি বলি, ঐ অবোধ নিষ্পাপ শিশুটিকে দোষ দিয়া কি লাভ? তোমরা নিজেরাই তো তাহাকে আহবান করিয়া আনিয়াছ। শিশুদের যাহা হইবার তাহা তো হইবেই। নাকের চিকিৎসা শেষ হইতে না হইতেই হয়ত কানের পীড়া আরম্ভ হইয়া গেল। তাছাড়া নিত্য দিনের

হাগা-মোতা ইত্যাদি উপসর্গ তো আছেই। শিশু একটু সুস্থ হইলে যেন মায়ের দেহেও নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়, শিশু রোগাক্রান্ত হইলে মায়ের মনেও কোন শান্তি থাকে না। অর্থাৎ শিশুর পরিচর্যায় নিয়োজিত মায়ের জীবন যেন আশা ও ভয়ের মাঝে অবস্থানের এক অনিশ্চিত ও দোদুল্যমান জীবন। জননীর এই সীমাহীন ত্যাগ-শ্রম ও ধৈর্যের কারণেই প্রতিনিয়তঃ তাঁহার দরজা ও মর্যাদা বুলন্দ হইতে থাকে।

কিন্তু এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, দুই-চারি বৎসরের পরিচর্যার পর ছেলে বড় হইলেই সকল দুঃখ-যাতনার অবসান ঘটিবে। বরং দেখা যাইবে যে, শিশু বড় হওয়ার কয়েক বৎসর বিরতির পরই সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ-শাদী করিবে, ঘরে নাতী-নাতনীদের আগমন ঘটিবে। অর্থাৎ আবার সেই ঝামেলা এবং সেই পুরাতন অবস্থা ফিরিয়া আসিয়া নূতন যন্ত্রণা শুরু হইবে। ঘরময় মল-মূত্র দ্বারা নোংরা হওয়া, লাগাতার রোগ-ব্যাধির উপসর্গ- ইত্যাদি অবস্থানসমূহ যেন পুনরায় তাজা হইয়া দেখা দিবে। এই হইল ঘর-সংসার ও পারিবারিক জীবনের শান্তি।

মোটকথা, কোন পরিবারই বর্ণিত পেরেশানী ও ঝামেলা হইতে মুক্ত নহে। কিন্তু তবুও এই ঘর-সংসারেই মানুষের আসক্তির কোন অন্ত নাই। সংসারের ঝামেলা ছাড়া যেন এক দণ্ডও তাহাদের শান্তি হয় না।

আমার এক ভাই মাঝে-মধ্যে একটি ঘটনা বলিতেন যে, এক ব্যক্তির অনেক সন্তান ছিল। একবার কেহ তাহাকে বলিল, আপনি নিশ্চয়ই বেশ শান্তিতে আছেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করা হইতেছে? শান্তি অপর কাহারো ঘরে হইতে পারে, আমার ঘরে শান্তি কোথায়? বিবি বাল-বাচ্চায় মাশাআল্লাহ আমার ঘর ভর্তি। আজ একজনের কান ব্যথা, কাল হয়ত কাহারো নাসিকাপীড়া, কেহ পড়িয়া গেল কি অপর কাহারো কাটিয়া গেল- এই হইল আমার ঘরের অবস্থা। সুতরাং এখানে তুমি শান্তির কি দেখিলে? শান্তি বরং এমন ঘরে হইতে পারে যেই ঘরে বাল-বাচ্চার কোন ঝামেলা নাই।

বাস্তবিক, বাল-বাচ্চার সংসারে এক দণ্ড শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলার উপায় থাকে না। কিন্তু সন্তান প্রতিপালনে মাতাপিতার এই সুদীর্ঘ শ্রমের পরিণাম যদি অশুভ হয়, পরিণত বয়সে সন্তান যদি মাতাপিতাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়া চলে, বৃদ্ধ মাতাপিতার খেদমতের পরিবর্তে তাহাদের সঙ্গে যদি অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়, তবে মাতাপিতার অন্তরে কতটা ব্যথা অনুভূত হইবে তাহা

বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এই যদি হয় সন্তান ও সন্তান প্রতিপালনের পরিণতি তবে মানুষের পক্ষে এই সন্তান কামনা করার সঙ্গত কোন কারণ থাকিতে পারে না।

নিঃসন্তানদের প্রতি

আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আহমদ দেহলভী ছাহেবের মামা ছিলেন হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মাহবুব আলী জা'ফরী ছাহেব। আমার উস্তাদের শৈশবকালের ঘটনা।

একবার তিনি স্বীয় মামাকে চিন্তাযুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে পেরেশান মনে হইতেছে কেন? জবাবে তিনি আক্ষেপের সহিত বলিলেন, বার্ধক্য আসিয়া পড়িল অথচ এই বয়সেও আমার একটি সন্তান হইল না। আমার উস্তাদ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, সোব্‌হানাল্লাহ! ইহা কি কোন দুঃখের কথা হইল? ইহা তো বরং খুশির কথা। তিনি বলিলেন, ইহা খুশির কথা হইবে কেমন করিয়া? জবাবে আমার উস্তাদ বলিলেন, অবশ্যই ইহা খুশির কথা বটে। কারণ, আপনার গোটা খান্দানের মধ্যে একমাত্র আপনিই হইলেন মূল উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। অর্থাৎ আপনার বাপ-দাদাসহ অপরাপর যাহাদেরই সন্তান আছে, তাহাদের কেহই মূল উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নহে। বরং তাহাদিগকে যেন বংশ রক্ষা এবং এই কাজের বিবিধ পেরেশানী সহ্য করার জন্যই পয়দা করা হইয়াছে।

মনে করুন, কৃষকরা জমিতে চাষ করিয়া যেই গম উৎপাদন করে, উহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগ রাখা হয় খাওয়ার জন্য এবং অপর ভাগে সামান্য কিছু রাখা হয় বীজের জন্য। এই দুই অংশের মধ্যে খাওয়ার জন্য যেই অংশ রাখা হয় উহাই মূল উদ্দিষ্ট অংশ। অর্থাৎ খাওয়ার জন্যই ফসল উৎপাদন করা হয়। বীজের জন্য রক্ষিত অংশ মূল উদ্দেশ্য নহে। বরং উহাকে মূল উদ্দেশ্যের মাধ্যম বলা যাইতে পারে। সুতরাং হযরত আদম (আঃ) হইতে আজ পর্যন্ত নিঃসন্তান ব্যক্তিবর্গরাই হইলেন মূল উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যাহাদের সন্তানাদি হইতেছে তাহারা মূল উদ্দেশ্য নহে, বরং তাহাদিগকে মূল উদ্দেশ্যের মাধ্যম তথা সেই বীজের জন্য রক্ষিত অংশের মত মনে করা যাইতে পারে।

যাহাই হউক, উপরোক্ত আলোচনা হইতে নিঃসন্তান ব্যক্তিগণ সান্ত্বনা গ্রহণ করিতে পারেন। অবশ্য এই আলোচনাটি একটু সূক্ষ্ম বটে। সুতরাং উহার দ্বারাও যদি নিঃসন্তানদের মনের দুঃখ নিবারণ না হয় তবে বর্তমান দুনিয়ায় যাহাদের

সন্তান আছে তাহাদের দিকে নজর করিলেও অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যাইবে যে, আজ সন্তানাদি লইয়া তাহারা কি পেরেশানীর মধ্যে দিন কাটাইতেছে। উহাতেও সান্ত্বনা না আসিলে মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিবে যে, আল্লাহ পাক আমার জন্য যাহা ফায়সালা করিয়াছেন উহাতেই আমার কল্যাণ নিহিত। সন্তান হইলেই উহা আমার জন্য কল্যাণকর হইত কি-না তাহা আমার জানা নাই। যদি এইরূপ কল্পনা করাও সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ ইহা ধারণা করিবে যে, সন্তান না হওয়ার ব্যাপারে আমার স্ত্রীর কোন অপরাধ নাই।

যেই সন্তান মৃত্যুবরণ করে তাহার জন্য মৃত্যুই উত্তম ছিল

হযরত খিজির (আঃ) এবং হযরত মূছা (আঃ)-এর ঘটনা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত খিজির (আঃ) একটি শিশুকে হত্যা করিলে হযরত মুছা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি কারণে একটি নিস্পাপ শিশুকে হত্যা করিলেন? কিন্তু হযরত খিজির (আঃ) ইতিপূর্বেই হযরত মূছা (আঃ)-এর সঙ্গে এই শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, আমার সঙ্গে থাকিতে হইলে আমার কোন কাজেরই প্রতিবাদ করা যাইবে না। সুতরাং তিনি উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, আমি তো পূর্বাহ্নেই বলিয়াছিলাম যে, আপনার পক্ষে ধৈর্যধারণ করা সম্ভব হইবে না।

পরে তিনি উপরোক্ত ঘটনার কারণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, ঐ শিশুটির মাতাপিতা হইল মুসলমান। কিন্তু বড় হইয়া এই শিশুটি কাফের হইত এবং সন্তানের মোহাব্বতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার মাতাপিতাও কাফের হইয়া যাইত। এই কারণেই আল্লাহ পাক তাহাদের সন্তানটিকে শৈশবেই দুনিয়া হইতে বিদায় করিয়া তাহার পরিবর্তে একটি নেক সন্তান দান করার ইচ্ছা করিলেন।

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা জানা গেল যে, যেই সন্তানটি শৈশবে মৃত্যুবরণ করে, তাহার ঐ সময় মৃত্যুবরণ করাই উত্তম ছিল। এই কারণেই দ্বীনদার-পরহেজগার ব্যক্তিবর্গ স্বীয় সন্তানাদির মৃত্যুতে দুঃখিত হয় বটে কিন্তু পেরেশান হয় না। যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাককে হেকমতওয়ালা মনে করিবে সে কোন প্রকার দুর্ঘটনা-দুর্বিপাক ও দুর্যোগের কারণেই পেরেশান হইবে না।

অবশ্য যেই সকল বিষয়ে তাহার দৃষ্টি ও ধারণা সুস্পষ্ট নহে, সেই সকল বিষয়ে তাহার মনে হা-হুতাশ জাগে বটে। যেমন কোন সন্তানের ইন্তেকালের

পর মনে করা হয় যে, হায়! সে যদি জীবিত থাকিত তবে এইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হইত ইত্যাদি।

ভাই সকল! কে ভাল হইত আর কে মন্দ হইত উহা কেহই বলিতে পারে না। যেই সন্তানটিকে আল্লাহ মৃত্যু দান করিয়াছেন, নিশ্চয়ই উহাতে কোন না কোন হেকমত নিহিত আছে। এমন হওয়াও অসম্ভব নহে যে, মৃত্যুবরণকারী সন্তানটি বড় হইয়া কাফের হইত এবং তাহার মাতাপিতাকেও কাফের বানাইয়া ছাড়িত।

শিশু-সন্তানের মৃত্যুর হেকমত ও ফজিলত

শিশু-সন্তানদের মৃত্যুর অনেক হেকমত ও ফজিলত রহিয়াছে। যদি সেই সকল হেকমত ও ফজিলতের বিষয়গুলি সামনে রাখা হয় তবে সন্তান-শোকে মর্ম বেদনার পাশাপাশি কিছুটা সান্ত্বনারও উপাদান পাওয়া যাইবে।

আসলে মানুষ কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া এমনিতেই সন্তান বড় হওয়ার বাসনা পোষণ করে। অন্যথায় ইহা কেহই বলিতে পারে না যে, সন্তান বড় হইয়া মাতাপিতার শান্তির কারণ হইবে, না মুসীবতের কারণ হইবে। আর এই বিষয়েও কোন নিশ্চয়তা নাই যে, বড় হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে তাহারা পরকালে মাতাপিতার সাহায্যকারী হইবে, না নিজেরাই সাহায্যের মোহতাজ হইয়া হাজির হইবে। কিন্তু নাবালেগ ও নিষ্পাপ শিশুদের পারলৌকিক পরিণতির বিষয়ে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। বরং পরকালের কঠিন বিপদের দিনে তাহারা মাতাপিতার সাহায্যকারীই হইবে।

হাদীসের বিবরণ দ্বারা জানা যায়, মৃত্যুবরণকারী শিশুরা বেহেশ্তে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত পরকালে শিশু অবস্থায়ই বিরাজ করিবে। তাহাদের স্বভাব-প্রকৃতিও শিশুদের মতই থাকিবে। অর্থাৎ কথায় কথায় জিদ ও পীড়াপীড়ি করা, কোন কিছুর পিছনে পড়িয়া থাকা– ইত্যাদি শিশুসুলভ আচরণগুলি তাহারা সেখানেও প্রদর্শন করিবে। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের পর আর তাহাদের মধ্যে ঐ স্বভাব বর্তমান থাকিবে না। বরং জান্নাতে প্রবেশের পর পিতা-পুত্রের দৈহিক কাঠামো ও স্বভাব-প্রকৃতি একই ধরনের হইবে।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– পরকালে শিশুরা জিদ ধরিয়া আল্লাহ পাকের নিকট আরজ করিবে, যতক্ষণ না আমাদের মাতাপিতাকে আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ততক্ষণ আমরা জান্নাতে প্রবেশ করিব না। আমরা বরং আমাদের মাতাপিতাকে সঙ্গে লইয়াই জান্নাতে যাইব। শিশুদের এই

নিবেদনের জবাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করিবেন, হে জেদি শিশু! তোমাদের মাতাপিতাকেও জান্নাতে লইয়া যাও। অতঃপর তাহারা আনন্দের সহিত পিতামাতাকে জান্নাতে লইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে সন্তান যদি বড় হইয়া ইন্তেকাল করে, তবে হযরত খিজির (আঃ)-এর ঘটনা স্মরণ করিয়া নিজেকে এইভাবে বুঝাইবে যে, উহাতে কি হেকমত আছে তাহা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। যদি সে আরো কিছুকাল জীবিত থাকিত তবে বিপথগামী হইয়া পিতামাতার জন্য মুসীবতের কারণ হওয়াও অসম্ভব ছিল না।

অতঃপর হাদীসে পাকে বালা-মুসীবত ও বিপদাপদের যেই হেকমত এবং উহার উপর ধৈর্যধারণ করিলে যেই ছাওয়াবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা পাঠ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ শোকের মাত্রা হ্রাস পাইয়া অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যাইবে।

সারকথা হইল, আল্লাহ পাক যাহাকে সন্তান দিয়াছেন তাহার জন্য উহাতেই কল্যাণ এবং যাহাকে সন্তান দেন নাই তাহার জন্যও নিঃসন্তান হওয়াতেই কল্যাণ। অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক যাহাকে সন্তান দান করিয়া পুনরায় উহা ফেরৎ লইয়াছেন উহাতেও নিশ্চয়ই কোন হেকমত রহিয়াছে।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই ব্যক্তির তিনটি সন্তান ইন্তেকাল করিয়াছে, পরকালে তাহারা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুনের আড় হইয়া যাইবে। কেহ আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কাহারো দুইটি সন্তান ইন্তেকাল করে। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের মতই জবাব দিলেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কাহারো মাত্র একটি সন্তানই ইন্তেকাল করে? এরশাদ হইলঃ তবে সেও (জাহান্নামের আগুনের আড় হইবে)। সবশেষে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেই ব্যক্তির কোন সন্তানই মৃত্যুবরণ করে নাই? এইবার পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ এই ক্ষেত্রে আমি উম্মতের অগ্রবর্তী হইয়া ছামান সংগ্রহকারী হইব এবং আমার উম্মতের জন্য আমার ওফাতের মত দুর্ঘটনা আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং আমার ওফাতের শোকই তাহাদের মাগফেরাতের জন্য যথেষ্ট হইবে। অর্থাৎ আমি আগে গিয়া আমার উম্মতের মাগফেরাতের জন্য চেষ্টা ও সুপারিশ করিব।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নিঃসন্তানদের জন্য যেমন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত যথেষ্ট হইবে, অনুরূপভাবে সন্তানের মাতাপিতাদের জন্যও তো উহা যথেষ্ট হইবে। এতএব, সন্তানদের সুপারিশের কি প্রয়োজন ছিল? উহার জবাবে আমরা বলিব, দুই কারণেই উহার প্রয়োজন ছিল–

প্রথমতঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আদব ও ভয়ের সঙ্গে সুপারিশ করিবেন, কিন্তু নাবালেগ শিশুরা জিদ ধরিয়া সুপারিশ করিবে। শিশুরা দুনিয়াতে যেমন মাতাপিতার সঙ্গে জিদ করে, অনুরূপভাবে পরকালেও তাহারা আল্লাহর সঙ্গে জিদ-অভিমান করিবে।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– শিশুরা জান্নাতের ফটকে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। তাহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বলা হইলে তাহারা জবাব দিবে, যতক্ষণ আমাদের পিতামাতাকে আমাদের সঙ্গে দেওয়া না হইবে, ততক্ষণ আমরা জান্নাতে প্রবেশ করিব না। এই সময় আল্লাহ পাক ঘোষণা করিবেন, হে স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে জিদকারী শিশুরা! যাও, তোমাদের মাতাপিতাকেও জান্নাতে লইয়া যাও।

দ্বিতীয়তঃ যদিও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু মানবিক বিবেচনা ও সাধারণ যুক্তির দাবি হইল– সুপারিশকারীদের সংখ্যা বেশী হইলে মনের জোর ও সান্ত্বনাও বৃদ্ধি পাইবে।

"বাইতুল হাম্‌দ" সমাচার

একটি হাদীসের মফহুম এইরূপঃ কোন মুসলমানের নাবালেগ সন্তানের ইন্তেকালের পর ফেরেশতা যখন তাহার রূহ লইয়া আসমানে গমন করে, তখন আল্লাহ পাক ফেরেশ্‌তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি আমার বান্দার শিশু-সন্তানের প্রাণ লইয়া আসিয়াছ? ফেরেশতা জবাব দেয়– আয় পরওয়ারদিগার! হাঁ, (আমি তাহার প্রাণ লইয়া আসিয়াছি)। আল্লাহ পাক পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি আমার বান্দার কলিজার টুকরা লইয়া আসিয়াছ? ফেরেশতা এইবারও আগের মত জবাব দেয়। অতঃপর আল্লাহ জানিতে চান, সন্তানের মৃত্যুর কারণে আমার বান্দা কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছে? ফেরেশ্‌তা আরজ করে, হে পরওয়ারদিগার! বান্দা ধৈর্যধারণপূর্বক আপনার শোকর আদায় করিয়াছে।

ফেরেশ্‌তার মুখে বান্দার ছবর ও শোকরের কথা শুনিয়া রাব্বুল আলামীন

ঘোষণা করিবেন, হে ফেরেশ্‌তা! তুমি সাক্ষী থাকিও আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। জান্নাতে আমার বান্দার জন্য একটি মহল তৈরী কর এবং উহার নাম রাখ "বাইতুল হাম্‌দ"।

বয়স্ক সন্তানের ইন্তেকালের ফজিলত

হাদীসে পাকে বয়স্ক সন্তানদের ইন্তেকালেরও ফজিলত বিবৃত হইয়াছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেনঃ আমি যেই ব্যক্তির প্রিয়জনকে লইয়া লইব- ঐ প্রিয়জন ছোট হউক বা বড় (ভাই হউক বা স্ত্রী) উহার বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নহে। এখানেও উত্তম বিনিময়ের কথা বলা হইয়াছে। কারণ, জান্নাতের মত উত্তম বিনিময় আর কিছুই হইতে পারে না।

মোটকথা, আপনজনদের ইন্তেকালে ধৈর্য ধারণ করিলে পরকালে উহার উত্তম বিনিময় লাভ করা যাইবে। প্রিয়জনদের ইন্তেকালে ধৈর্যধারণের বিষয়টি এক আরব বেদুঈন (গ্রাম্য ব্যক্তি) আরবী কবিতায় বড় চমৎকারভাবে প্রকাশ করিয়াছে। কাব্যপ্রীতি যেন আরবদের মজ্জাগত স্বভাব ছিল। এমনকি আরব-রমণী ও শিশুরা পর্যন্ত কবিতা রচনা করিতে পারিত।

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তদীয় পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলে ঐ আরব বেদুঈন নিম্নের কবিতায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন–

اصبر تكن بك صابرين فانما

صبر الرعية بعد صبر الراس

অর্থাৎ– হে ইবনে আব্বাস! আপনি ছবর ও ধৈর্যধারণ করুন, যেন আপনার দেখাদেখি আমরাও ধৈর্যধারণ করিতে পারি। অর্থাৎ আপনি হইলেন অনুসরণীয় ব্যক্তি, সাধারণ লোকেরা আপনার কার্যকলাপ অনুসরণ করিবে। সুতরাং এই ধরনের মুসীবতের সময় যদি আপনি ধৈর্যধারণ করেন, তবে আমরাও বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করিতে পারিব। আর আপনি যদি ছবর না করেন, তবে সাধারণ লোকেরাও বিপদে ধৈর্যধারণ করিতে পারিবে না।

সোব্‌হানাল্লাহ! লোকটি কি চমৎকার উপমা দ্বারা সান্ত্বনা দিয়াছে। পরে সে আরো বলিয়াছে–

خير من العباس اجرك بعده + و الله خير منك للعباس

অর্থাৎ– হযরত আব্বাস (রাঃ) জীবিত থাকার তুলনায় তাঁহার ইন্তেকালে

আপনি যাহা লাভ করিয়াছেন, উহা অনেক-অনেক উত্তম। কারণ, তিনি জীবিত থাকিলে বড়জোর আপনি "তাঁহাকে" লাভ করিতেন। কিন্তু তাঁহার ইন্তেকালে আপনি লাভ করিয়াছেন "ছাওয়াব" যাহা আপনার জন্য হযরত আব্বাসের তুলনায় উত্তমই বটে।

অর্থাৎ- ছাওয়াবই হইল আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি। আরো সোজা কথায়ঃ হযরত আব্বাসের ইন্তেকালে ধৈর্যধারণের ফলে আপনি আল্লাহকে লাভ করিয়াছেন। আর আল্লাহ নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা উত্তম। এদিকে হযরত আব্বাসের নিকটও আপনার তুলনায় আল্লাহ উত্তম। আর মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি সেই আল্লাহর নিকটই গমন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার ইন্তেকাল না হইলে তিনি এই দুনিয়াতেই অবস্থান করিতেন। আর এই দুনিয়াতে থাকিয়া "রুইয়াতে এলাহী" বা আল্লাহর দিদার লাভ করা সম্ভব নহে।

কাহারো মৃত্যুতে সান্ত্বনা লাভের আরেকটি উপায় হইল- যে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহার সম্পর্কে এইরূপ ধারণা করিবে যে, সে যদি এখন মৃত্যুবরণ না করিয়া বরং আরো কিছুকাল বিছানায় গড়াইবার পর মৃত্যুবরণ করিত, তবে হয়ত আত্মীয়-স্বজনরা তাহার সেবা-যত্ন করিতে করিতে অতিষ্ঠ হইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে ঘৃণা করিতে শুরু করিত। অর্থাৎ অবশেষে তাহাকে সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত। এই ক্ষেত্রে মৃতব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হইত। কারণ, এই অবস্থায় তোমরা মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করিতে না এবং তাহার নামে ছাওয়াবও পাঠাইতে না। কেননা, ঐ ব্যক্তির নামেই ছাওয়াব পাঠানো হয়, যেই ব্যক্তির ইন্তেকাল ও বিচ্ছেদে মানুষের অন্তরে ব্যথা অনুভব হয়। কিন্তু যেই ব্যক্তির ইন্তেকালে মানুষ খুশী হয় যে, "আপদ দূর হইয়া ভালই হইয়াছে"- এইরূপ ব্যক্তিকে সাধারণতঃ খুব কমই স্মরণ করা হয়।

অনুরূপভাবে তোমাদের জন্যও ইহাই উত্তম যে, তোমাদের আপন-জনরাও যেন (তোমাদের দৃষ্টিতে) ভাল অবস্থায় ইন্তেকাল করে। কারণ, এই অবস্থায় তোমরা তাহাকে স্মরণ করিবে এবং সেও তোমাদের জন্য দোয়া পাঠাইবে। অর্থাৎ উভয় পক্ষই পরস্পর দ্বারা উপকৃত হইবে।

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণের অনুপম দৃষ্টান্ত

আপন সন্তানের ইন্তেকালে ধৈর্যধারণ সংক্রান্ত হযরত উম্মে সুলায়মের বিরল ঘটনাটি হাদীসে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, তাহার একটি শিশু-সন্তান ছিল।

স্বামী হযরত তালহা (রহঃ) বাহির হইতে ঘরে ফিরিয়াই বাচ্চার হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন।

আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় একদিন সেই শিশুটি ইন্তেকাল করিল। সন্ধ্যায় হযরত তালহা (রাঃ) ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু স্ত্রী হযরত উম্মে সুলায়ম স্বামীকে সন্তানের কথা কিছুই জানাইলেন না। বরং তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এই সাঁঝের বেলা স্বামীকে সন্তানের মর্মন্তুদ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিলে তিনি হয়ত খানাপিনা কিছুই গ্রহণ করিবেন না এবং রাতভর কষ্ট পাইবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন স্বামী নিজেই সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন "সে এখন ভালই আছে"। ইহাতে হযরত তালহার মনে ব্যতিক্রম কোন ভাব সৃষ্টি হইল না এবং তিনি নিশ্চিন্তে আহার গ্রহণ করিলেন।

খানাপিনা শেষে হযরত তালহা (রাঃ) স্ত্রীর সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং তাহার 'সঙ্গ' পাইতে চাহিলেন। এই সময়ও স্ত্রী চরম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং অন্তরের শোক অন্তরেই গোপন রাখিয়া হাসিমুখে স্বামীকে সঙ্গ দান করিলেন।

সকালে তিনি যথাযথ হেকমতের সহিত স্বামীকে বলিলেন, আমি আপনাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের নিকট কেহ কোন বস্তু আমানত রাখিবার পর পরে যদি আবার সে উহা ফেরৎ চায়, তবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কি? হযরত তালহা জবাব দিলেন, মালিক যদি তাহার আমানতের বস্তু ফেরত চায় তবে খুশিমনে উহা ফেরত দেওয়াই আমাদের কর্তব্য। এইবার তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন তবে আপনিও আপনার সন্তানের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ পূর্বক তাহার দাফনের ব্যবস্থা করুন, কারণ আল্লাহ পাক আমাদের নিকট গচ্ছিত তাহার আমানত ফেরত লইয়াছেন।

স্ত্রীর মুখের কথা শুনিয়া হযরত তালহা রাগে ও শোকে স্তব্ধ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রাতেই কেন আমাকে এই সংবাদ দিলে না? স্ত্রী আদবের সহিত বলিলেন, তাহাতে কি লাভ হইত? রাতের অন্ধকারে তাহাকে দাফন করিতেও সমস্যা হইত এবং আপনিও আহারাদি গ্রহণ না করিয়া সারা রাত পেরেশান থাকিতেন। এই কারণেই রাতে আমি আপনাকে কিছু বলি নাই।

পরে হযরত তালহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বিস্তারিত ঘটনা প্রকাশ করিলে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ আল্লাহ পাক উম্মে সুলায়মের এই

আমলটি অনেক পছন্দ করিয়াছেন এবং আমি আশা করিতেছি যে, (গত) রাতে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে একটি ভাগ্যবান সন্তান দান করিয়াছেন।

পরবর্তীতে (সেই রাতে হযরত উম্মে সুলায়মের গর্ভে সঞ্চারিত সন্তান) হযরত আব্দুল্লাহ বিন তালহা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি একজন উঁচু মানের আলেম, বড় দানশীল, প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক এবং বহু সন্তানের জনক ছিলেন।

হযরত উম্মে সুলায়ম যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, আমাদের সন্তানাদি আল্লাহ পাকের আমানত বটে। এই আমানত তিনি যখন ফেরৎ চাহিবেন তখন উহা খুশি মনে ফেরত দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখানে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সন্তান যদি (ফেরতযোগ্য) আমানতই হইবে, তবে আল্লাহ পাক এই সন্তানের প্রতি এত মোহাব্বত কেন পয়দা করিয়া দিলেন? (অর্থাৎ– যদি সন্তানের প্রতি কোন মোহাব্বত পয়দা করা না হইত, তবে তাহাদের ইন্তেকালে আমাদের মনেও কোন শোক সৃষ্টি হইত না। সুতরাং উহাই তো ভাল ছিল)। উহার জবাব হইল– মাতাপিতা যেন সন্তানকে সযত্নে প্রতিপালন করিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই তাহাদের প্রতি এই অনাবিল স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। অন্যথায় শিশুরা যেইভাবে মল-মূত্রে জড়াইয়া নোংরা হইয়া থাকে, অতঃপর মায়েদের পক্ষে তাহাদের সেবা-যত্ন সম্ভব ছিল না। এই কারণেই দেখা যায় মায়েরা নিজের সন্তানকে যেইভাবে প্রতিপালন করে, অপরের সন্তানকে সেই স্নেহ-যত্ন লইয়া লালন করিতে পারে না। মায়ের কোলে প্রতিপালিত শিশু যতই বড় হইতে থাকে, তাহার প্রতি মায়ের আকর্ষণও সেই হারে কমিতে থাকে। এই কারণেই দেখা যায়– বড় সন্তানের তুলনায় ছোট সন্তানের প্রতিই মাতাপিতার টান তুলনামূলক বেশী থাকে।

মোটকথা, সন্তানকে যদি আল্লাহর আমানত মনে করা হয় তবে তাহার তিরোধানে বিশেষ পেরেশানী ও হা-হুতাশ সৃষ্টি হইবে না। কারণ এই ক্ষেত্রে পেরেশানীর মূল কারণ হইল আজকাল সন্তানকে নিজের সম্পদ মনে করা হইতেছে।

সন্তান লাভের তদ্বির

১। সন্তান লাভে যে একেবারেই নিরাশ হইয়া গিয়াছে, নিম্নের দোয়াটি প্রতি নামাজের পর নিয়মিত তিনবার করিয়া পাঠ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ সে সন্তান লাভ করিবে। দোয়াটি এই–

رب لا تذرنى فردا و انت خير الوارثين *

ঐ ঃ দ্বিতীয়–

নিম্নের আয়াতটি সকাল-বিকাল নিয়মিত পাঠ করিতে থাকিলে আল্লাহ পাক নেক সন্তান দান করিবেন–

رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء.

ঐ ঃ তৃতীয়–

বন্ধ্যা স্ত্রীলোক সাতদিন রোজা রাখিয়া সন্ধ্যায় শুধু পানি দ্বারা ইফ্‌তারী করিবে। ইফ্‌তারীর পর নিম্নের আয়াত ২১ বার পাঠ করিলে আল্লাহ চাহেতো ঐ মহিলার গর্ভসঞ্চার হইবে। আয়াত এই–

او كظلمت فى بحر لجى يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . ظلمت بعضها فوق بعض . اذا اخرج يده لم يكد يراها . و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور *

ঐ ঃ চতুর্থ–

চল্লিশটি লবঙ্গের মধ্যে ৭ বার করিয়া উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করিয়া দম করিবে। হায়েজ হইতে পবিত্র হওয়ার পর ঐ লবঙ্গ প্রতি রাতে একটি করিয়া খাইবে। খাওয়ার পর পানি পান করিবে না। ঐ আমলের দিনগুলিতে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করিবে।

গর্ভরক্ষার তদ্বির

গর্ভরক্ষার নিয়তে নিম্নের আয়াতটি প্রতি নামাজের পর তিনবার করিয়া পাঠ করিলে গর্ভ রক্ষা হয়। আয়াতটি এই–

يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شىء عظيم *

ঐ ঃ দ্বিতীয়–

কোন মহিলার যদি গর্ভ নষ্ট হইয়া যাওয়ার ভয় হয় কিংবা গর্ভ স্থির না থাকে, তবে নিম্নের আয়াতটি লিখিয়া সঙ্গে ধারণ করিলে ইনশাআল্লাহ গর্ভ স্থির এবং উহার হেফাজত হইবে। আয়াতটি এই–

الله يعلم ما تحمل كل انثى و ما تغيض الارحام و ما تزداد و كل شىء عنده بمقدار *

সহজ প্রসব

নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া সহজ প্রসবের নিয়তে বাম রানে বাঁধিয়া দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ খুব আছানীর সহিত সন্তান ভূমিষ্ট হইবে। সন্তান প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা খুলিয়া ফেলিবে। আয়াত এই–

اذا السماء انشقت * و اذنت لربها و حقت * و اذا الارض مدت * و القت ما فيها و تخلت *

বদনজর হইতে হেফাজত

হযরত হাছান বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন, নিম্নের আয়াতটি বদনজর হইতে হেফাজতের জন্য খুবই উপকারী। উহা লিখিয়া শিশুর অঙ্গে বাঁধিয়া দিবে কিংবা পড়িয়া দম করিবে। আয়াতটি এই–

و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون انه لمجنون * و ما هو الا ذكر للعلمين *

সকল প্রকার বালা-মুসীবত হইতে হেফাজতের জন্য

নিম্নের তাবিজটি মাদুলিতে পুরিয়া মোম দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া সন্তানের গলায় বাঁধিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে সকল প্রকার বালা-মুসীবত হইতে নিরাপদ থাকিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم * اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض و رب السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء و هو السميع العليم *

বুকের দুধ বৃদ্ধির জন্য

১। সুরা হুজুরাত লিখিয়া পান করাইয়া দিলে বুকের দুধ বৃদ্ধি পায় এবং গর্ভ রক্ষা হয়।

২। সুরা হিজর জাফরান দ্বারা লিখিয়া পান করিলে বুকের দুধ বৃদ্ধি হয়।

শিশুর দুধ ছাড়ানোর জন্য

সুরা বুরুজ লিখিয়া শিশুর অঙ্গে বাঁধিয়া দিলে খুব আছানীর সহিত দুধ ছাড়িয়া দিবে।

শিশুর দাঁত

শিশুর দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে সুরা 'ক্বাফ' শুরু হইতে الخروج পর্যন্ত লিখিয়া পান করাইয়া দিলে খুব সহজে দাঁত গজাইবে।

অবাধ্য সন্তানের জন্য

অবাধ্য সন্তান বা স্ত্রীর কপাল স্পর্শ করিয়া যদি নিম্নের এছেমটি পাঠ করা হয় অথবা হাজার বার পাঠ করিয়া দম করা হয় তবে তাহারা বাধ্য হইয়া যাইবে। এছেমটি এই– الشهيد

গর্ভাবস্থায় মাতাপিতার কর্তব্য

গর্ভাবস্থায় মাতাপিতা যদি নিজেদের আমল–আখলাক দুরস্ত করিয়া নেক আমল করিতে থাকে তবে তাহাদের সন্তানও নেক হইবে। অর্থাৎ মাতাপিতার আমলের প্রভাব গর্ভস্থ সন্তানের উপরও প্রতিফলিত হয়।

এক বুজুর্গের একটি সন্তান ছিল বড় দুষ্ট প্রকৃতির। এক ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ঐ বুজুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর অলী! আপনার ঘরে এমন দুষ্ট সন্তান হইল কেমন করিয়া? বুজুর্গ জবাব দিলেন, একদিন আমি এক বিত্তবানের ঘরে আহার গ্রহণ করিয়াছিলাম। ঐ বিত্তবানের অর্থ-সম্পদ ছিল সন্দেহযুক্ত পথে উপার্জিত। ঐ খাবার গ্রহণের পর আমার দেহে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং আমি স্ত্রীগমন করি। আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় ঐ দিনই আমার স্ত্রী গর্ভবর্তী হয়। আমার এই সন্তানটি ঐ সন্দেহযুক্ত খাবারেরই ফসল।

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা ইহা জানা গেল যে, গর্ভাবস্থায় মাতাপিতা ভাল-মন্দ যেই আমল করিবে, গর্ভস্থ সন্তানের উপরও ঐ আমলের প্রভাব পড়িবে।

একটি ঘটনা

কোন এক স্থানের দুই স্বামী-স্ত্রী এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল যে, এখন হইতে আমরা আর কোন গোনাহের কাজ করিব না এবং অতীতের সকল অপরাধের জন্য তওবা করিয়া লইব। ফলে হয়ত (আমাদের নেক আমলের উছিলায়) আল্লাহ পাক আমাদেরকে একটি নেক সন্তান দান করিবেন। অতঃপর তাহারা

যথাযথভাবে ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিল এবং এই সময়ের মধ্যেই স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইল। পরে আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে তাহারা একটি নেক সন্তান লাভ করিল।

দিন গড়াইতে থাকে। শিশুটি মাতাপিতার আদর-যত্নে লালিত হইয়া বড় হইতে লাগিল। কিন্তু একদিন সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। এক দোকান হইতে একটি বড়ই চুরি করিয়া সে খাইয়া ফেলিল। এই ঘটনা জানিতে পারিয়া স্বামী স্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্য করিয়া বল আমাদের সন্তানের মধ্যে এই স্বভাব কেমন করিয়া আসিল। স্ত্রী নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া জবাব দিল, আমাদের প্রতিবেশীর বড়ই বৃক্ষের যেই ডালটি আমাদের আঙ্গিনাতে ঝুলিয়া আছে, একবার আমি উহা হইতে একটি বড়ই পাড়িয়া খাইয়াছিলাম। ঘটনা শুনিয়া স্বামী বলিলেন, সেদিনের তোমার সেই আচরণই আজ আমাদের সন্তানের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে।

মোটকথা, নেক সন্তান পাওয়ার প্রথম তদ্বির হইল প্রথমে মাতাপিতা নিজেরা নেক হওয়া।

প্রথম সন্তান স্ত্রীর পিত্রালয়ে হওয়া জরুরী নহে

আজকাল প্রায় সকল পরিবারেই ইহা জরুরী মনে করা হয় যে, প্রথম সন্তান স্ত্রীর পিত্রালয়েই হইতে হইবে। ফলে দেখা যায়– এই নিয়ম রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সন্তান হওয়ার পূর্বে তড়িঘড়ি করিয়া তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। অথচ এই ক্ষেত্রে ইহা চিন্তা করা হয় না যে, এই সময়টি তাহার সফরের জন্য উপযোগী কি-না। এই ধরনের অসতর্কতার কারণেই অনেক সময় শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং পরবর্তীতে সারা জীবন উহার মাশুল দিতে হয়। অথচ একটি অপ্রয়োজনীয় নিয়ম রক্ষা করিতে গিয়াই এত বড় ঝুঁকি গ্রহণ করা হইতেছে।

অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন তাহারা নিজেরাই শরীয়তের কোন নূতন বিধান বানাইয়া লইয়াছে। বিশেষতঃ যখন এইরূপ আকীদা করা হয় যে, এই নিয়ম রক্ষা না করিলে আমাদের কোন নহুসত (অমঙ্গল) কিংবা বদনাম হইবে তখন তো উহা আরো মারাত্মক। কারণ, নহুসত-কুলক্ষণ বা অমঙ্গলের আশঙ্কার সহিত শিরকের মিশ্রণ রহিয়াছে। আর বদনামের মিশ্রণ হইল অহংকারের সহিত। অহংকার হারাম হওয়ার বিষয়টি কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এই সকল বিষয়ে আমাদের সকলেরই সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

সন্তান প্রসবের সময় পর্দার ব্যাপারে অসতর্কতা

সন্তান প্রসবের সময় দাই বা নার্সের সম্মুখে কেবল জরুরত পরিমাণই কাপড় খোলা যাইবে। উহার অতিরিক্ত নহে। চিকিৎসার কারণেও যদি দেহের কোন অংশ আবরণমুক্ত করিতে হয় তবে সেই ক্ষেত্রেও জরুরতের কথাটি স্মরণ রাখিবে। যেমন, রানের উপর যদি ফোঁড়া হয় এবং ডাক্তারকে দেখাইতে হয়, তবে কেবল ফোঁড়ার জায়গাটুকুই দেখাইবে, বেশী দেখাইবে না। এইরূপ অবস্থায় কোন পুরাতন কাপড় দ্বারা সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া শুধু ফোঁড়ার জায়গাটুকু কাটিয়া দিলে ডাক্তার শুধু ফোঁড়ার জায়গাটুকু দেখিয়া লইবেন, আশপাশে আদৌ দেখিতে পারিবেন না। কিন্তু চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ বা নারী ঐ ফোঁড়ার জায়গাটুকুও দেখিতে পারিবে না। অথচ মুর্খ মেয়েলোকেরা প্রসবকালে এইভাবে উলঙ্গ করিয়া লয় যে, উপস্থিত সকল মহিলারাই দেখিতে থাকে। এই গর্হিত পাপ-প্রথা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিবে। ইহা সম্পূর্ণ হারাম।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ সতর যে দেখিবে এবং যে দেখাইবে, উভয়ের উপরই আল্লাহর লান'ত পড়িবে। এই বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

গর্ভকালে এবং অন্য কোন কারণে যদি ধাত্রী দ্বারা পেট মালিশ করাইবার প্রয়োজন হয় তবে সেই ক্ষেত্রেও নাভির নীচের অংশ খোলা জায়েজ নহে। কোন কাপড় রাখিয়া উহার উপর দিয়া মালিশ করাইবে। বিনা প্রয়োজনে ধাত্রীকেও দেখানো যাইবে না। সাধারণতঃ পেট মালিশ করাইবার সময় ধাত্রীতো দেখে বটেই, সেই সঙ্গে মা, বোন, খালা, ফুফু, দাদী, নানী, চাচী, মামী, ননদ ইত্যাদি বাড়ীর অন্যান্য মহিলারাও দেখে। ইহা সম্পূর্ণ নাজায়েজ।

কাফের নারীদিগকেও পর্দা করিতে হইবে। তাহাদের সামনেও কেবলমাত্র হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখ ব্যতীত দেহের অপর কোন অংশ এমনকি মাথার একটি চুলও খোলা জায়েজ নহে। সুতরাং ধাত্রী যদি হিন্দু-খৃষ্টান ইত্যাদি অমুসলমান হয়, তবে প্রসবের সময় কেবল আবশ্যকীয় স্থান ব্যতীত হাতের কব্জির উপরের অংশ, পায়ের গোছা, গলা ও মাথা ইত্যাদি দেখাইলে গোনাহগার হইবে।

নবজাতকের বিষয়ে মছনূন তরীকা

সন্তান পয়দা হওয়ার পর নিম্নের বিষয়গুলির উপর আমল করা সুন্নত–

✯ প্রথমে গোসল করাইয়া তাহার ডান কানে আজান এবং বাম কানে একামত বলিবে।

✯ কোন দ্বীনদার-পরহেজগার বুজুর্গের মুখের চিবানো সামান্য খুরমা বাচ্চার মুখে দিবে।

ইহা ব্যতীত অপরাপর সকল নিয়ম-প্রথা এবং আজান দেওয়া উপলক্ষে মিষ্টি বিতরণ– ইত্যাদি সবই অযৌক্তিক এবং মাকরূহ।

শিশুর মুখে খাবার তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে হযরত মওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, কোন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের মুখের চিবানো খাবার যদি হয় তবে তো উহা সুন্নত; অন্যথায় নবজাতককে কোন বেদআতীর মুখের থুথু খাইতে দিলে উহাতে কি লাভ হইবে?

কানে আজান দেওয়ার রহস্য

নবজাতকের কানে কি কারণে আজান দেওয়া হয় এই বিষয়ে কেহ কেহ লিখিয়াছেনঃ শিশুর কানে আজান-একামত দেওয়ার অর্থ হইল তাহাকে এই কথা বলিয়া দেওয়া যে, আজান-একামত হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু নামাজের অপেক্ষা (নামাজ শুরু হইতে যেই সামান্য বিলম্ব উহাই তোমার জীবন)।

উহার অপর হেকমত হইলঃ আজান-একামতের মাধ্যমে শিশুর কানে প্রথমেই আল্লাহর পবিত্র নাম পৌঁছাইয়া দেওয়া যেন উহার প্রভাবে তাহার ঈমানের ভিত্তি মজবুত হইয়া যায় এবং শয়তান দূরে সরিয়া যায়। এই দুইটি হেকমতেরই সারমর্ম হইল– দুনিয়াতে আসিবার পর তুমি আল্লাহকে ভুলিয়া গাফেল হইয়া থাকিও না।

কয়েকটি জরুরী বিষয়

কোন কোন স্থানে দেখা যায়, নবজাতককে ভেষণের পানি দ্বারা গোসল করানো হয়। ইহা না করিয়া প্রথমে লবণের পানি দ্বারা গোসল করাইয়া উহার কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার পানি দ্বারা গোসল করাইবে। উহার ফলে শিশু চর্মরোগসহ বিবিধ শারীরিক উপসর্গ হইতে হেফাজতে থাকিবে। কিন্তু লবণের পানি যেন নাক, কান এবং মুখে যাইতে না পারে সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখিবে।

শিশুর গায়ে যদি ময়লা বেশী থাকে তবে কয়েকদিন পর্যন্ত লবণের পানি দ্বারা গোসল করাইবে। আর ময়লা বেশী না থাকিলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত

তিন-চারি দিন পর পর পরিষ্কার পানি দ্বারা গোসল করাইয়া তৈল মালিশ করিয়া দিবে। (শীত মৌসুমে বুঝিয়া-শুনিয়া গোসল করাইবে)।

✯ শিশুকে চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত তৈল মালিশ করা ভাল।

✯ শিশুকে বেশী আলোকময় স্থানে রাখিবে না। অধিক আলোর প্রভাবে শিশুর চোখের জ্যোতি কমিয়া যায়।

✯ শিশুকে এক পার্শ্বে বেশীক্ষণ শোয়াইয়া রাখিবে না এবং কোন একদিকে দীর্ঘ সময় তাকাইয়া থাকিতে দিবে না। উহার ফলে শিশু রাতকানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

✯ শিশুকে কখনো খারাপ দুধ পান করাইবে না। দুধের ভাল-মন্দ যাচাই করিবার সহজ উপায় হইল– এক ফোটা দুধ নখের উপর লইয়া দেখিবে, যদি উহা সঙ্গে সঙ্গে গড়াইয়া পড়ে কিংবা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত না গড়ায়, তবে এই উভয় অবস্থায়ই ঐ দুধ নষ্ট। আর সামান্য গড়াইবার পর যদি থামিয়া থাকে তবে মনে করিবে উহা ভাল। আর যেই দুধের উপর মাছি বসে না উহাও খারাপ।

✯ শিশুকে দুধ পান করাইবার পূর্বে কোন মিষ্টিদ্রব্য যেমন মধু বা খুরমা চিবাইয়া নরম করিয়া তাহার মুখের তালুতে সামান্য লাগাইয়া দিবে।

✯ বুকের দুধ ভারী হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হইবে।

✯ কোলের শিশুকে একা ঘরে রাখিয়া কোথাও যাইবে না।

এক মহিলা তাহার দুধের শিশুকে একাকী ঘরে রাখিয়া কোথাও কাজে গিয়াছিল। এই ফাকে ঘরের বিড়াল শিশুটিকে আঁচড়াইয়া-কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিল। এই ঘটনা দ্বারা দুইটি শিক্ষা পাওয়া গেল– প্রথমতঃ দুধের শিশুকে একাকী রাখিয়া কোথাও যাইতে নাই। দ্বিতীয়তঃ কুকুর-বিড়ালের কোন বিশ্বাস নাই।

এক শ্রেণীর কাণ্ডজ্ঞানহীন মহিলা বাচ্চাদের বিছানায় বিড়াল দেখিয়া তাড়ায় না, বরং উহাদেরও সঙ্গে শুইতে দেয়। ইহা ঠিক নহে। কারণ, রাতে শিশুর হাত-পা বিড়ালের গায়ে পড়িলে কামড়- আঁচড় বসাইয়া দিতে পারে। এইরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

প্রসূতিকে অপবিত্র এবং অচ্ছুত মনে করা

এক শ্রেণীর মানুষ প্রসূতিকে নাপাক এবং অচ্ছুত (যাহাকে ছোয়া যায় না) মনে করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া চলে। তাহাদের নিকট বসা

এবং স্পর্শ করা ঘৃণার বিষয় মনে করা হয়। এমনকি তাহারা কোন পাত্র স্পর্শ করিয়া ফেলিলে উহা ধোয়া-মাজা না করিয়া ব্যবহার করা হয় না। এই সকল নিয়ম-প্রথা একেবারেই অর্থহীন।

সমাজের আরেকটি দুষ্টপ্রথা হইল- প্রসূতির নেফাসের মুদ্দত শেষ হওয়ার পর গোসল করিয়া পাক হওয়ার পূর্বে তাহার স্বামীকে নিকটে আসিতে দেওয়া হয় না। এই সময় স্বামী নিকটে আসাকে,দোষণীয় এবং খারাপ মনে করা হয়। এই নিয়মের ফলে অনেক সময় সীমাহীন জটিলতা সৃষ্টি হইতেও দেখা যায়। স্ত্রীর হয়ত এমন কিছু অসুবিধা থাকে যাহা স্বামী ব্যতীত অপর কাহারো নিকট প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু স্বামীকে নিকটে আসিতে না দেওয়ার কারণে সে ঐ অসুবিধা লইয়াই দিন কাটাইতে থাকে। তাছাড়া কোন অসুবিধা না থাকিলেও স্বামীর তো তাহার সন্তানকে দেখিবার ইচ্ছাও হইতে পারে। ইহা কেমন যুক্তির কথা যে, দুনিয়ার সকলেই আসিয়া বাচ্চাকে দেখিতে পারিবে কিন্তু যাহার বাচ্চা সে কাছেও আসিতে পারিবে না? এই যদি অবস্থা হয় তবে তো বলিতে হয়- এমন সন্তানই ঘরে আসিল, যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ পয়দা করিয়া দিল।

পাক হওয়ার পর নামাজে বিলম্ব

সন্তান প্রসবের কারণে দীর্ঘ চল্লিশ দিন নারীদের নামাজ হইতে বিরত থাকিতে হয়। কিন্তু পাক হওয়ার পর যথা সময় নামাজ আদায়ে অযথাই বিলম্ব করা হয়। অনেক ভাল ভাল নামাজী মহিলারাও এই ক্ষেত্রে অবহেলা করিয়া থাকে। কিন্তু শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান হইল, রক্ত বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোসল করিয়া পাক হইবে এবং গোসল করা ক্ষতিকর হইলে তাইয়াম্মুম করিয়া নামাজ শুরু করিয়া দিবে। বিনা ওজরে এক ওয়াক্ত নামাজ ত্যাগ করিলেও বড় কঠিন গোনাহ হইবে।

হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে- এইরূপ ব্যক্তিরা দোজখে ফেরাউন, হামান ও কারুনের সঙ্গে অবস্থান করিবে।

প্রসূতি চল্লিশ দিন পূর্বে পাক হইয়া গেলেও চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাহার নামাজ পড়া নিষিদ্ধ মনে করা হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। নেফাসের সর্বোচ্চ সময় হইল চল্লিশ দিন। কমের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। যখনই পাক হইবে গোসল করিয়া নামাজ শুরু করিয়া দিবে। অনুরূপভাবে চল্লিশ দিনের পরও যদি রক্ত বন্ধ না হয় তবে চল্লিশ দিনের পর হইতে নিজেকে পাক মনে করিয়া নামাজ আদায় শুরু করিয়া দিবে।

একটি প্রসিদ্ধ নিয়ম হইল- প্রসূতির নেফাস শেষে গোসল করিয়া পাক হওয়ার পূর্বে তাহার হাতের কোন জিনিস খাওয়া নাজায়েজ মনে করা হয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হায়েজ-নেফাসের অবস্থায় হাত নাপাক হয় না।

সন্তানের জন্ম উপলক্ষে উপহার সংগ্রহের অনুষ্ঠান

সন্তানের জন্ম উপলক্ষে পাড়া-প্রতিবেশী ও সকল আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করা হয় এবং তাহারা সকলেই আসিয়া (প্রথা অনুযায়ী) নবজাতককে কিছু কিছু উপহার দিয়া যায়।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, এই ক্ষেত্রে উপহার দাতাদের উদ্দেশ্য ও নিয়ত কি থাকে?যেই সময় এই রেওয়াজ চালু করা হয় তখন উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা আমাদের জানা নাই। সম্ভবতঃ আত্মীয়-স্বজনদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন করা হইত। কিন্তু বর্তমানে এই সকল অনুষ্ঠানে যাহা হইতেছে, তাহাতে ইহা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, মনের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে হইলেও আগন্তুকদের সকলকেই কিছু না কিছু দিতে হইবেই। অন্যথায় সকলের সম্মুখে নিজেকে খাটো করিতে হইবে। স্বজনদের মধ্যে কোন কোন মহিলা হয়ত নিজেরাই নেহায়েত বেহাল অবস্থায় আছে, অথচ তাহাদিগকেও বার বার পীড়াপীড়ি করিয়া অনুষ্ঠানে হাজির হইতে বাধ্য করা হয়। যদি না আসে তবে জীবন ভর এই লইয়া খোটা দেওয়া হয়।

মোটকথা, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, সেখানে যাইতেই হইবে এবং কিছু দিয়াও আসিতে হইবে। এইভাবে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া জবরদস্তি কিছু আদায় করা পরিষ্কার জুলুম নয় তো কি? অর্থাৎ স্বজনদের একত্র সমাগমে আনন্দের পরিবর্তে অনেকের জন্য উহা কঠিন মুসীবতের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যত যাহাই হউক, এই টেক্স আদায় করিতেই হইবে- এই বিষয়ে কাহারো সঙ্গে কোন খাতির নাই। সরকারী টেক্স আদায়ের ক্ষেত্রেও অনেক সময় দুই-এক মাস বিলম্ব করা যায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে এক মিনিটও বিলম্ব করিবার কোন উপায় নাই। বরং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উহার আয়োজন করিয়া তবে অনুষ্ঠানে যাইতে হইবে।

এক্ষণে বলুন, এইভাবে মানুষকে বাধ্য করিয়া কিছু আদায় করা, নিজের পরিজনকে উহা আদায় করার মাধ্যম বানানো এবং এই পদ্ধতিতে কিছু দেওয়া কেমন করিয়া জায়েজ হইতে পারে? যাহারা দেয় তাহাদেরও নিয়ত থাকে-

নিছক সুনাম অর্জন ও বড়মানুষী প্রদর্শন, যাহা হাদীসে পাকে নিষেধ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে– যাহারা সুনাম-শোহরতের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করিবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাহাদিগকে জিল্লতির পোশাক পরিধান করাইবেন।

সুতরাং ইহা দ্বারা জানা গেল যে, সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা জায়েজ নহে। অথচ এই ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনই থাকে মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লোকেরা বলিবে যে, অমুকে এই পরিমাণ উপহার দিয়াছে। আর যদি না দেওয়া হয় তবে খোটা দিয়া বলা হইবে যে, এমন বখিলী করিয়া আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? অর্থাৎ এই ধরনের নিয়তের কারণেই দাতারাও গোনাহগার হইবে।

এক্ষণে যাহারা উহা গ্রহণ করিতেছে তাহাদের অবস্থা লক্ষ্য করুন। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– মোমিন-মুসলমানের সম্পদ তাহার আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতীত (গ্রহণ করা) হালাল নহে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন পরিস্থিতির শিকার হইয়া কোন কিছু দিতে বাধ্য হয়, তখন গ্রহীতার পক্ষে উহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। আর দাতা যদি বিত্তবান হয় এবং উহা দেওয়াতে সে কোন কষ্ট অনুভব না করে তবে এই ক্ষেত্রেও এই উপহার দেওয়ার পিছনে তাহার উদ্দেশ্য থাকে অহংকার ও বড়মানুষী প্রদর্শন।

এই সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য হইল– রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল মানুষের দাওয়াত কবুল করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহারা নিজেদের অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে দাওয়াত করে। অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তিদের খাবার কিংবা অন্য কিছু গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, এই ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের গোনাহের কাজে সহযোগিতা করা হয়। আর গোনাহের কাজে সহযোগিতা করাও গোনাহ বটে। সারকথা হইল, উপরোক্ত পদ্ধতিতে উপহার গ্রহীতারাও গোনাহগার হইতেছে।

এখন গৃহের অন্যান্য সদস্য যাহারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছে তাহাদের অবস্থাও লক্ষ করুন। ইহারাই মানুষকে ডাকিয়া ডাকিয়া এই গোনাহের অনুষ্ঠানে শরীক করিয়াছে। সুতরাং ইহাদিগকেও গোনাহের অংশ লইতে হইবে।

মোটকথা, সন্তানের জন্ম উপলক্ষে এমন উপহার সংগ্রহের আয়োজন করা হইল যাহা সকল পক্ষকেই গোনাহগার বানাইয়া ছাড়িল।

আজকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেই সকল উপহার আমদানী হয়, গ্রহীতার পক্ষে

উহা করজই বটে। (কারণ, ফেরৎ পাওয়ার নিয়তে যাহা দেওয়া হয় উহাকেই করজ বলা হয়। আজকাল বিবাহ-শাদীসহ এই জাতীয় অনুষ্ঠানে উপহার হিসাবে যাহা দেওয়া হয় উহার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অদল-বদলের খেয়াল করা হয়। অর্থাৎ সামনে তো আমাদেরও অনুষ্ঠান আসিতেছে, তখন কি আর তাহারা খালি হাতে আসিতে পারিবে? কিংবা আমাদের অনুষ্ঠানে তাহারা শাড়ী দিয়াছিল, এখন আমরা শাড়ী না হউক, অন্ততঃ .... ইত্যাদি ইত্যাদি –অনুবাদক)।

কিন্তু বিনা প্রয়োজনে করজ গ্রহণ করিতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে। আর করজের হুকুম হইল, যখনই তোমার সুযোগ হইবে তখনই উহা পরিশোধ করিয়া দিবে। অথচ এই ক্ষেত্রে শরীয়তের এই নিয়ম রক্ষা করা হয় না। বরং তাহার বাড়ীতেও অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কেহ দুই-চারি দিন পরই উহার বদলা দিতে চাহিলে কেহই উহা গ্রহণ করিবে না।

এই জাতীয় উপহারকে মুখে করজ বলিয়া স্বীকার না করিলেও কার্যতঃ উহা করজ বলিয়াই সাব্যস্ত হয়। সুতরাং করজ সাব্যস্ত হওয়ার পর উহা আদায়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান অমান্য করার কারণে পৃথকভাবে গোনাহগার হইতে হইবে। করজ আদায়ের নিয়ম হইল, হাতে টাকা-পয়সা আসামাত্রই উহা আদায় করিয়া ফেলিবে। আর কোন ব্যবস্থা না হইলে বিলম্ব করাতে কোন অপরাধ হইবে না। অথচ এই ক্ষেত্রে নিয়ম হইল, দাতার সঙ্গতি আছে কি নাই তাহা বিবেচনার বিষয় নহে; বরং এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই উহা দিতে হইবে।

সারকথা হইল– সকল দিক হইতেই এই সকল অনুষ্ঠানে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে। এই কারণেই এই সকল রুসম-প্রথা না জায়েজ।

শিশুর যত্ন

★ শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য হইল মায়ের দুধ। মা যদি সুস্থ থাকে তবে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে মায়ের দুধ অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর কিছু নাই। সুতরাং মা যদি সুস্থ থাকে তবে শিশুকে মায়ের দুধই খাইতে দেওয়া উচিত।

★ শিশুকে যদি ধাত্রী-মাতার দুধ খাওয়াইতে হয় তবে এমন স্বাস্থ্যবান যুবতী মহিলা ঠিক করিবে যেন তাহার দুধও টাটকা হয় (অর্থাৎ তাহার সন্তানের বয়স পাঁচ-ছয় বৎসরের বেশী না হয়)। তা ছাড়া ঐ মহিলা দ্বীনদার পরহেজগার ও সৎস্বভাবসম্পন্না হওয়াও আবশ্যক।

★ শিশুর বয়স সাত দিন হওয়ার পর তাহাকে দোলনায় শোয়াইতে শুরু করিবে। শিশুকে কোলে রাখা হউক কিংবা দোলনায়, তাহাদের মাথা সকল

সময় উঁচা করিয়া রাখিবে। তবে শিশুদেরকে দোলনায় ঝুলানোর বেশী অভ্যাস করা উচিত নহে। কেননা, দোলনা সর্বত্র পাওয়া যায় না এবং উহা সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যাওয়াও কষ্টকর হয়।

✯ শিশুদেরকে অধিক সময় কোলে রাখিবে না। উহাতে তাহাদের শরীর দুর্বল হইয়া যায়।

✯ শিশুদেরকে মায়ের কোলের সঙ্গে না শোয়াইয়া বরং একটু দূরে চতুর্দিকে উঁচু করিয়া ঠেস দিয়া শোয়াইবে। কারণ, অনেক সময় ঘুমন্ত অবস্থায় মায়ের পাশ ফিরার সময় শিশুরা মার হাত-পা বা পিঠের নীচে পড়িয়া জীবন হারায়। অনেক সময় শিশুর হাত-পাও ভাঙ্গিয়া যায়।

✯ শিশুরা যেন সকলের কোলেই যায় এই অভ্যাস করাইবে। কোন একজনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতে দিবে না। কারণ সে যদি অন্যত্র চলিয়া যায় বা মরিয়া যায় তখন শিশুকে সামলানো ভয়ানক মুসীবত হইবে।

✯ প্রতিদিন শিশুর হাত-পা, মুখমণ্ডল, গলা ও কান ইত্যাদি ভিজা কাপড় দ্বারা ভালভাবে মুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। অন্যথায় তৈলের সহিত ময়লা জমাট বাঁধিয়া ঐ সকল স্থানে ঘা ও বিবিধ চর্মরোগ দেখা দিতে পারে।

✯ শিশুরা পায়খানা-প্রস্রাব করার সঙ্গে সঙ্গে পানি দ্বারা ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া দিবে। শুধু কাপর দ্বারা মুছিয়া দেওয়া যথেষ্ট মনে করিবে না। কারণ, শুধু মুছিয়া দিলে পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু দুর্গন্ধ থাকিয়া যায় এবং পায়খানার রস শুকাইয়া যাওয়ায় উহার তেজস্ক্রিয় পদার্থের কারণে খোস্কা পড়ে এবং খুজলী-পাঁচড়া হইয়া থাকে। সুতরাং পানি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দেওয়াই উত্তম। শীতের দিনে বার বার ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করিলে সর্দি লাগিতে পারে। তাই পানি একটু গরম করিয়া লইবে।

✯ দুধ ছাড়ানোর পূর্বে যখন শিশুকে কিছু কিছু আলগা খাইতে দিবে তখন এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে যেন তাহাকে কোন শক্ত খাবার দেওয়া না হয়। উহার ফলে দাঁত উঠিতে বিলম্ব এবং চিরদিনের জন্য দাঁত কমজোর হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দাঁত উঠার সময় একেবারে পেট ভরিয়া আহার করাইবে না এবং পানিও বেশী পান করাইবে না। উহাতে শিশুর হজমশক্তি দুর্বল হইয়া যাইতে পারে। পেট সামান্য ফাঁপা দেখিলেই আহারে কিছুটা বিলম্ব করিবে এবং শুইয়া থাকিতে দিবে। উহাতে উদরস্থ খাবার হজম হইয়া শিশু দ্রুত সুস্থ হইয়া উঠিবে।

✯ শিশুরা যখন খানা খাওয়ার উপযুক্ত হয় তখন ধাত্রী বা চাকরানীর হাতে খানা খাওয়াইবার ভার দিবে না। নিজ হাতে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমতী নারীর সম্মুখে খাওয়াইবে, যেন অধিক খাওয়াইয়া শিশুকে অসুস্থ করিয়া না ফেলে।

✯ শিশুদের যখন কিছু বুদ্ধি হয়, তখন তাহাদিগকে নিজ হাতে এবং ডান হাতে খাইতে অভ্যস্ত করাইবে। খাওয়ার পূর্বে হাত-মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া দিবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে যেন শিশুদের কম খাওয়ার অভ্যাস গরিয়া উঠে। ফলে তাহারা রোগমুক্ত ও লোভমুক্ত থাকিতে পারিবে।

✯ শিশুদেরকে বিশেষ কোন খাবারের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইতে দিবে না। বরং সকল ধরনের খাবারেই তাহাদিগকে সহনীয় করিয়া তুলিবে এবং কোন খাবারই যেন অতিরিক্ত না খায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। উদরস্ত খাবার হজম হওয়ার পূর্বে অন্য খাবার গ্রহণ করিতে দিবে না। যাবতীয় মৌসুমী ফল-ফলাদী (অল্প হইলেও) খাইতে দিবে। কিন্তু অতিরিক্ত টক খাইতে দিবে না। শিশুদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিবে যেন খানা খাওযার সময় এবং পানি পান করার সময় কখনো না হাসে। কারণ, উহার ফলে খাদ্যকণা ও পানীয় নাসিকা রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মারাত্মক ধরনের অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে।

✯ যথাসম্ভব শিশুদেরকে উত্তম খাবার খাইতে দিবে। কেননা, এই বয়সে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হইয়া সারা জীবন সুস্থ থাকিবার ভিত গড়িয়া উঠিবে। বিশেষতঃ শীত মৌসুমে রকমারী ফল-ফলাদী, তেলেভাজা মিষ্টি, নারিকেল এবং মিসরী খাওয়াইলে দেহ শক্তিশালী হইবে।

✯ শিশুদেরকে এই অভ্যাস করাইবে যেন কেহ কিছু খাইতে দিলে ঘরে আনিয়া মাতাপিতার সম্মুখে খায়। নিজেনিজেই খাইতে বারণ করিবে।

✯ শিশুদেরকে এই অভ্যাস করাইবে যেন নিজেদের মুরব্বী ব্যতীত অপর কাহারো নিকট কিছু না চায়। অনুরূপভাবে অন্য কাহারো দেওয়া বস্তু যেন মুরব্বীদের হুকুম ছাড়া গ্রহণ না করে।

✯ শিশুদেরকে অতিরিক্ত আহলাদ দেওয়া ঠিক নহে। কেননা বেশী আহলাদে তাহাদের স্বভাব নষ্ট হইয়া যায়।

✯ শিশুদেরকে খুব টাইট-ফিট পোশাক দিবে না। খুব দামী পোশাকও পরাইবে না। তবে ঈদের সময় সাধ্যমত ভাল পোশাক দেওয়া উচিত।

আকীকা

❀ ছেলে বা মেয়ে জন্মিলে সপ্তম দিবসে তাহার নাম রাখিয়া আকীকা দিবে। ইহাতে সন্তানের বালা-মুসীবত দূর হয় এবং যাবতীয় আপদ-বিপদ হইতে নিরাপদ থাকে।

❀ ছেলে হইলে আক্বীক্বায় দুইটি বকরী বা দুইটি ভেড়া আর মেয়ে হইলে একটি বকরী বা একটি ভেড়া জবাই করিবে। অথবা কোরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ এবং মেয়ের জন্য এক অংশ লইবে। সন্তানের মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলিবে এবং চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা বা রূপা দান করিয়া দিবে। মনে চাহিলে বাচ্চার মাথায় জাফরান লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

❀ সামর্থ্য না থাকিলে ছেলের পক্ষ হইতে একটি বকরী আক্বীক্বা করাও জায়েজ। আক্বীক্বা না করিলেও কোন অপরাধ হইবে না।

❀ জন্মের সপ্তম দিবসে আক্বীক্বা করা মোস্তাহাব। যদি সপ্তম দিবসে করা সম্ভব না হয় তবে যেই দিনই করা হউক, যেই বারে সন্তান জন্ম হইয়াছে উহার আগের দিন করিবে। যেমন, শুক্রবার সন্তান হইয়া থাকিলে বৃহস্পতিবার সপ্তম দিবস হইবে। বৃহস্পতিবারে জন্ম হইলে বুধবার আক্বীক্বা করিবে। মোটকথা, হিসাব করিয়া সপ্তম দিবস ঠিক রাখিতে চেষ্টা করিবে।

❀ যেই প্রাণী দ্বারা কোরবানী দুরস্ত নহে, উহা দ্বারা আক্বীক্বাও দুরস্ত নহে। আর যেই প্রাণীর কোরবানী দুরস্ত উহা দ্বারা আক্বীক্বাও দুরস্ত হইবে।

❀ আক্বীক্বার গোস্ত কাঁচা ভাগ করিয়া দেওয়া, কিংবা রান্না করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া বা দাওয়াত করিয়া খাওয়ানো সবই জায়েজ। আক্বীক্বার গোস্ত বাপ, দাদা, নানা, নানী সকলেই খাইতে পারিবে।

আক্বীক্বার জন্য সপ্তম দিবস নির্ধারণের কারণ

আক্বীক্বার জন্য সপ্তম দিবস নির্ধারণের কারণ হইল, সন্তানের জন্ম ও আক্বীক্বার মধ্যে সময়ের কিছুটা ব্যবধান থাকা জরুরী। কারণ বাচ্চা হওয়ার পর সকলেই নবজাতকের প্রাথমিক সেবা-যত্ন লইয়াই ব্যস্ত থাকে। সুতরাং এই সময় আক্বীক্বার আয়োজন করা সকলের জন্যই কষ্টকর হইবে।

তা ছাড়া অনেক সময় ছাগল-ভেড়া তালাশ করিয়া জোগাড় করিতেও সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রথম দিবসেই যদি আক্বীক্বার দিন ধার্য করা হইত তবে সকলের জন্যই উহা পেরেশানীর কারণ হইত। এই কারণেই সাত

দিনের ব্যবধান রাখা হইয়াছে যেন আছানীর সহিত সকল কিছু আন্জাম দেওয়া যায়।

অনুরূপভাবে সপ্তম দিবসে নাম রাখিতে বলার কারণ হইল, একে তো সাত দিনের পূর্বেই নবজাতকের নামের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিয়া একটি ভাল নাম নির্বাচনের জন্য কিছুটা সময়েরও প্রয়োজন হয় বটে।

ছেলের জন্য দুই বকরী এবং মেয়ের জন্য এক বকরী হওয়ার কারণ

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ ছেলের জন্য আক্বীক্বা হইল দুই বকরী এবং মেয়ের জন্য এক বকরী।

উহার কারণ হইল, মানুষের নজরে মেয়ের তুলনায় ছেলেকে লাভজনক মনে করা হয়। সুতরাং যাহা অধিক মূল্যবান ও লাভজনক, উহার জন্য দুইটি জবাই করাই বাঞ্ছনীয়।

আল্লামা ইবনে কাইম (রহঃ) লিখিয়াছেনঃ ছেলের পক্ষ হইতে দুইটি এবং মেয়ের পক্ষ হইতে একটি আক্বীক্বা করার কারণ হইল, মেয়ের তুলনায় ছেলের ফজিলত ও গুরুত্ব বেশী। আর ছেলের নেয়মত পাইয়া পিতা যেহেতু অধিক খুশী হয়, সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে অধিক শুকরিয়া আদায় করাও কর্তব্য। অর্থাৎ অধিক নেয়মতের অধিক শুকরিয়া আদায় করাই বিধেয়।

মাসআলা

ছেলের জন্য দুইটি বকরী এবং মেয়ের জন্য একটি বকরী আক্বীক্বা দিবে। আর বড় জন্তুর মধ্যে শরীক হইলে ছেলের জন্য দুই অংশ এবং মেয়ের জন্য এক অংশ দিবে। আর সঙ্গতির অভাবে যদি ছেলের জন্যও এক অংশ দেওয়া হয় তবে উহাও জায়েজ আছে।

বাচ্চার চুলের সমপরিমাণ রৌপ্য দান করা

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত-হোছাইন সম্পর্কে তাঁহার মাতাকে বলিলেন, হে ফাতেমা! তাহার মাথার চুল মুণ্ডন করিয়া দাও এবং ঐ চুলের সমতুল্য রৌপ্য দান করিয়া দাও।

এই রৌপ্য দান করার কারণ হইল, একটি সন্তান মায়ের উদর হইতে

ভূমিষ্ঠ হইয়া দুধ পান করার পর্যায় পর্যন্ত উপনীত হওয়া ইহা আল্লাহ পাকের অশেষ নেয়মত বটে। সুতরাং এই বিষয়ে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা কর্তব্য। আর উত্তম শোকর হইল উহার বিনিময়ে কিছু দান করিয়া দেওয়া। এদিকে ঐ চুল হইল মায়ের উদরস্ত সন্তানেরই অংশ বিশেষ। আর উহা দূর হওয়া দুধ পান করার পর্যায়ে উপনীত হওয়ারই লক্ষণ। সুতরাং সন্তানের এই বিকাশ-বিবর্তন ও প্রবৃদ্ধি উপলক্ষেই রৌপ্য দান করা কর্তব্য।

এখানে বিশেষভাবে রৌপ্য দান করিতে বলার অর্থ হইল, স্বর্ণ বহু দামী বস্তু। বিত্তবান শ্রেণী ব্যতীত অপর সকলের পক্ষে উহা দান করা সম্ভব হইবে না। আর অন্যান্য বস্তুর মূল্য একেবারেই কম। কিন্তু মূল্যমানের দিক হইতে রৌপ্য হইল মধ্যম পর্যায়ভুক্ত। এই কারণেই রৌপ্য দান করার কথা বলা হইয়াছে।

প্রচলিত ভুল ধারণা

এক শ্রেণীর মানুষের ধারণা হইল, আক্বীক্বার জানোয়ারের হাড় ভাঙ্গা যাইবে না এবং জবাই করার পর উহার মাথা হাজামকে দিয়া দিতে হইবে। এই ধারণা সঠিক নহে। মাঝে মাঝে এই সকল নিয়ম-প্রথার বিপরীতও করা উচিত যেন মানুষ উহাকে জরুরী মনে করিতে না পারে। আবার কেহ কেহ মনে করে, আক্বীক্বার গোস্ত দাদা ও নানা-নানী খাইতে পারিবে না। এই ধারণাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

সমাজের আরেকটি কু-প্রথা হইল- বাচ্চার মাথার চুল মুণ্ডানোর উদ্দেশ্যে যখন তাহার মাথায় খুর রাখা হইবে, ঠিক সেই মূহূর্তেই আক্বীক্বার জন্তু জবাই করিতে হইবে। এই ধারণাও সঠিক নহে।

আক্বীক্বা উপলক্ষে লেন-দেন

আক্বীক্বার ক্ষেত্রে আরেকটি প্রচলিত রুছম হইল- নবজাতকের মাথা মুণ্ডানোর সময় খান্দানের সকল আত্মীয়-স্বজন জড়ো হয় এবং সম্মুখে রক্ষিত পাত্র বা থলিতে নগদ টাকা-পয়সা দিতে থাকে এবং ঐ সকল হাদিয়া নাপিতের হক মনে করা হয়। আর স্বাভাবিকভাবে প্রদত্ব এই টাকা-পয়সাকে করজ মনে করা হয়। আর এই করজও এমন যাহা যেকোন সময় পরিশোধ করিলে হইবে না, বরং দাতাদের বাড়ীতে যখন এই ধরনের কোন অনুষ্ঠান হইবে তখনই উহা আদায় করিতে হইবে। এই লেন-দেনকে এমনই আবশ্যক মনে করা হয় যে, যথাসময় নিজের হাতে টাকা-পয়সা না থাকিলে ধার-করজ এমনকি সূদের টাকা

লইয়া হইলেও উহা আদায় করিতেই হইবে। অথচ সূদ গ্রহণ বা প্রদান উভয়ই শরীয়তে নিষিদ্ধ।

মোটকথা, এই জাতীয় লেন-দেনে বিবিধ ক্ষতির দিক রহিয়াছে। যেমন- দেওয়ার সময়ই নিয়ত খালেছ না হওয়া। কারণ, ইহা নিশ্চিত যে, অনেক সময় তওফীক না থাকিলেও সকলের নিকট লজ্জিত হওয়া ও দুর্নামের ভয়ে বাধ্য হইয়াই কিছু না কিছু দিতে হয়। অর্থাৎ- কষ্ট করিয়া দিতে পারিলে সুনাম-সুখ্যাতি লাভ হইবে। শরীয়ত ইহাকেই নিষেধ করিয়াছে। সুনাম অর্জনের জন্য মাল খরচ করা হারাম।

অনুরূপভাবে গ্রহীতাদের পক্ষে উহা ক্ষতির কারণ হইল- কেহ কোন বস্তু দিলে উহা তাহার অনুগ্রহই বটে, কিন্তু কাহারো নিকট হইতে জবরদস্তি কোন অনুগ্রহ আদায় করা হারাম। অথচ এই ক্ষেত্রে উহা জোরপূর্বক আদায় করা হইতেছে। কারণ, মানুষ দুর্নামের ভয়েই উহা দিয়া থাকে। আর যাহারা সন্তুষ্টিচিত্তে দিয়া থাকে তাহাদের উদ্দেশ্যও থাকে সুনাম অর্জন- যা কোরআন ও হাদীসে পরিষ্কার নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং যদি কিছু দিতেই হয় তবে উহার উত্তম নিয়ম হইল, অন্য কোন সময় গোপনে দিয়া দিবে।

আক্বীক্বা উপলক্ষে নানার বাড়ীর পক্ষ হইতে পোশাক ও খাবার প্রদানের প্রথা

বাচ্চার আক্বীক্বা উপলক্ষে তাহার নানার বাড়ীর পক্ষ হইতে কিছু পোশাক ও খাবার প্রেরণের একটি প্রথা চালু আছে। এই ক্ষেত্রেও প্রধান মন্দের দিকটি হইল- উপস্থিত সময়ে নানাদের সঙ্গতি না থাকিলেও প্রথা অনুযায়ী পোশাক ও খাবার অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। অর্থাৎ একটি অপ্রয়োজনীয় ও গোনাহের কাজ এমন গুরুত্বের সহিত সম্পন্ন করা হয় যে, এই ক্ষেত্রে শরীয়তের কোন বিধান লংঘন হইতেছে কি-না তাহাও লক্ষ্য করা হয় না। আর এই দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়ত থাকে সেই সুনাম-সুখ্যাতি এবং অহংকার প্রদর্শন- যাহা পরিষ্কার হারাম হওয়ার বিষয়টি বার বার আলোচনা করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ছেলায়ে রহমী ও ভাল ব্যবহার করাও এবাদত। উহার জবাব হইল- যদি ছেলায়ে রহমী করাই উদ্দেশ্য থাকে, তবে কেবল নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের সময়ই তাহাদের বাড়ীতে উহা লইয়া যাওয়া হয়, আর অন্য সময় যখন তাহারা ভাতে কাপড়ে কষ্ট পায় তখন তাহাদের কোন খোঁজ-খবরও লওয়া হয় না- উহার কারণ কি?

খৎনার বিবরণ

✽ শিশুদের মধ্যে কিছুটা সহনশক্তি পয়দা হওয়ার পরই গোপনে হাজাম ডাকাইয়া খৎনা করিয়া দিবে।

✽ ঘা শুকাইয়া যাওয়ার পর গোসল করাইয়া দিবে।

✽ যদি সঙ্গতি থাকে এবং নিজের উপর কোন প্রকার চাপ অনুভব না হয় তবে কোন প্রকার সুনাম-সুখ্যাতির নিয়ত না করিয়া আল্লাহ পাকের শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং দুই-চারিজন মিসকীনকে খাবারের নিমন্ত্রণ করিবে। তবে এই নিয়মও বার বার জারী রাখিবে না। অন্যথায় উহাও রুসমে পরিণত হইবে।

✽ খৎনা উপলক্ষে চিঠির মাধ্যমে কিংবা লোক পাঠাইয়া মানুষ জড়ো করা সুন্নতের খেলাফ। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে হযরত হাছান (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত ওসমান বিন আবিল আস (রাঃ)-কে কেহ খৎনা উপলক্ষে দাওয়াত করিলে তিনি ঐ দাওয়াতে যাইতে অস্বীকার করিলেন। পরে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় আমরা (খৎনার দাওয়াতে) যাইতাম না।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা ইহা জানা গেল যে, যেই বিষয়টি জানাজানি করার ব্যাপারে শরীয়ত কোন গুরুত্ব দেয় নাই; সেই বিষয়ে লোকজনকে জড়ো করা সুন্নতের খেলাফ। অথচ আজকাল এই খৎনা উপলক্ষে বিশেষ গুরুত্বের সহিত বহু নিয়ম-প্রথা পালন করা হইতেছে।

হযরত ওসমান বিন আবিল আস (রাঃ) কর্তৃক খৎনার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার ঘটনা দ্বারা ইহা জানা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম এই দাওয়াত পছন্দ করিতেন না। উহার কারণ হইল, কোন বিষয়ে মানুষকে আহবান করার অর্থ হইল ঐ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া। তো শরীয়ত যেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় নাই উহাকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হইল দ্বীনের মধ্যে নূতন নিয়ম প্রবর্তন করা।

এই কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) লোকজনকে চাশতের নামাজে মসজিদে জড়ো হইতে দেখিয়া উহাকে বেদআত আখ্যা দিয়াছিলেন। উহার ভিত্তিতেই ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ নফল নামাজের জামায়াতকে মাকরূহ বলিয়াছেন।

খৎনার দাওয়াত

একবার আমার এক আপনজন তাহার ছেলের খৎনা উপলক্ষে আমাকে

দাওয়াত করিয়া বলিল, আপনাকে অবশ্যই যাইতে হইবে। সাধারণতঃ মানুষ আপনজনদের উপর এইরূপ জোর করিয়া থাকে। আমি তাহাকে বলিলাম, 'এছলাহুর রুছুম' কিতাবে আমি খৎনার দাওয়াতের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছি, সেখানে হাদীসও লিখিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে আমি নিজেই কেমন করিয়া খৎনার দাওয়াত গ্রহণ করিব? অনেকে হয়ত বলিবে যে, স্বজনদের সঙ্গে এইরূপ আচরণ বড়ই নির্মম। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হইল– (শরীয়তের হুকুম মান্য করিতে গিয়া) প্রিয়জনদের সঙ্গেও এইরূপ আচরণ করিতে হয়।

একবার এক শিয়ার বাড়ীতে ছেলের খৎনা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠান হইতে সে আমার জন্যও খাবার পাঠাইলে আমি এই মর্মে লিখিত মন্তব্যসহ ঐ খাবার ফেরৎ পাঠাইলাম যে, আমাদের নিকট সুন্নত তরীকার যাবতীয় খাবারের তালিকা মওজুদ আছে; কিন্তু তোমার প্রেরীত ঐ খাবার এই তালিকা বহির্ভূত। সুতরাং এই বিষয়ে আমাকে অপারগ মনে করিবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার পক্ষ হইতে এইরূপ জবাব পাওয়ার পর সে উহার কোন প্রতিবাদ করে নাই। আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ হইতেও এই জাতীয় খাবার আসিলে আমি উহা গ্রহণ করি না।

একটি ঘটনা

একবার রামপুরের এক বিত্তবান মাওলানা সাহেব ছেলের খৎনা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আমাকেও দাওয়াত করিলেন। যথাসময় আমিও উহাতে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। এই ঘটনার পূর্বেই আমি "এছলাহুর রুছুম" কিতাবটি লিখিয়াছিলাম (ঐ কিতাবে খৎনার দাওয়াতের বিপক্ষে মত প্রকাশ করা হইয়াছে)।

দাওয়াতে রওনা হওয়ার পর আমি মনে মনে এইরূপ স্থির করিলাম যে, আমি প্রথমে কাজী এনামুল হক সাহেবের বাড়ীতেই উঠিব এবং (কৌশল হিসাবে) উহার কারণ এই ব্যাখ্যা করিব যে, মজলিশে আমার মুরব্বী শ্রেণীরও অনেকে উপস্থিত থাকিবেন। সুতরাং সেখানে গেলে আমাকে তাহাদের আদব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আর যাহারা আমার ছোট তাহারা আমার আদব রক্ষায় ব্যস্ত থাকিবে। ফলে না আমার আরাম হইবে, না তাহাদের আরাম হইবে। অর্থাৎ সকলকেই একটা বিব্রতকর অবস্থার শিকার হইতে হইবে। ঐ অনুষ্ঠানে হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান এবং হযরত মাওলানা খলীল আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

এশার নামাজের সময় আমি শুনিতে পাইলাম যে, আমভাবে সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া জড়ো করা হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এইভাবে ডাকা হইতেছে কেন? আমাকে বলা হইল– আজ তো খান্দানের সকলকেই দাওয়াত করা হইয়াছে, এই কারণেই সকলকে ডাকা হইতেছে। আমি মনে মনে শঙ্কিত হইলাম যে, অবস্থা বিশেষ সুবিধার নহে। ইতিপূর্বে আমি নিজেই এছলাহুর রুছুম কিতাবে এই জাতীয় দাওয়াতে অংশগ্রহণ নিষেধ করিয়াছি। এখন আমি নিজেই যদি উহাতে শরীক হই তবে আমার কিতাবে মানুষের কিছুই উপকার হইবে না। এই কারণেই আমি চিন্তা করিলাম, আমি কাজী এনামুল হক সাহেবের বাগানে চলিয়া যাইব এবং ঐ মজলিশে অংশগ্রহণ করা হইতে বাঁচিয়া থাকিব। আর আমি যে ঐ বাগানে থাকিতে পারি ইহা কেহ কল্পনাও করিবে না। অবশ্য ইহা সত্য যে, এই ক্ষেত্রে আমাকে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু তবুও উহাতে অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে কিছুতেই সঙ্গত হইবে না।

এই সফরেও আমার লেখার সরঞ্জাম সঙ্গে ছিল। আমি উহা লইয়া শেষ রাতের দিকে বাগানে চলিয়া গেলাম। পরে লোকেরা আমাকে আশপাশের পথে পথে তন্ন তন্ন করিয়া তালাশ করিয়াও আমার সন্ধান করিতে পারে নাই। অবশেষে ট্রেণ আসার সময় হইলে আমি তথা হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনে চলিয়া আসিলাম। এখানে মাওলানা মুঈনুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তিনিও ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আসিয়াছিলাম। (এই কথা তিনি এই কারণে বলিলেন যে, ইতিপূর্বে তিনিও একবার আমাকে খৎনার অনুষ্ঠানে দাওয়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহার দাওয়াত গ্রহণ করি নাই।) তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি মনে মনে এই চিন্তা করিয়া আসিতেছিলাম যে, তুমি আমাদের মত গরীবদের দাওয়াত ফিরাইয়া দাও, আর বিত্তবানদের দাওয়াতে শরীক হও। কিন্তু অনুষ্ঠানে তোমাকে না পাইয়া মনের ঝাল মনেই রহিয়া গেল। ঝগড়া আর করা হইল না। আমি চলিয়া আসিলাম। যাক, তুমিই যখন উহাতে শরীক হও নাই; সুতরাং আমিও ঐ দাওয়াতে শরীক হইব না।

এই সময় একটি মজার কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আমি তখন সুরা নমল পাঠ করিতেছিলাম। উহাতে হুদহুদ পাখীর ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। আমার এক দোস্তকে ডাকিয়া বলিলাম, পবিত্র কোরআনেও আমার আজকের এই ঘটনার নজির রহিয়াছে। যেমন, এরশাদ হইয়াছে–

و تفقد الطير فقال مالى لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين * لاعذبنه عذابا

شديدا أو لا اذبحنه او ليأتينى بسلطن مبين *

অর্থঃ সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর লইলেন। অতঃপর বলিলেন, কি হইল; হুদহুদকে দেখিতেছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব কিংবা জবাই করিব অথবা সে উপস্থিত করিবে উপযুক্ত কারণ।

মোটকথা, সেখানে যেমন হুদহুদ পাখীর সন্ধান শুরু হইয়াগিয়াছিল, এখানেও আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় হুদহুদ বলা হয় বেওকুফকে; এদিকে আমিও বেওকুফই বটে। হুদহুদ পাখী হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর লশকর হইতে গায়েব হইয়া গিয়াছিল। এখানে আমিও সকলের সমাগম হইতে গায়েব হইয়া গিয়াছি। হুদহুদের শাস্তি নির্ধারণ হইয়াছিল আজাব কিংবা জবাই। এখানে আমারও তিরস্কার করা হইয়াছে, ইহাও নফ্সের জবাই বটে।

হুদহুদ পাখী হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে এমন একটি বিষয়ের সংবাদ দিয়াছিল, যাহা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। ইহা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, নাকেছ বা ছোটদের পক্ষেও কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা সম্পর্কে অবগত থাকা এবং কামেল ও বড়দের পক্ষেও সেই বিষয়ে কোন এলেম না থাকা– ইহা অসম্ভব নহে। অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের জন্য কোন ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে যদি আমার ধারণা থাকে এবং আমাদের মহান বুজুর্গানে দ্বীন যদি সেই সম্পর্কে অবগত না থাকেন তবে ইহাও কোন অসম্ভব বিষয় নহে। কালামে পাকে আলোচিত ঘটনায় যেমন, নারী বিলকিসের রাজত্ব ছিল এখানেও নারীদের কর্তৃত্বের ফলেই এই সকল রুসম-রেওয়াজ চালু হইয়াছে।

মোটকথা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এলেম কাহারো বেশী হওয়া ইহা কোন কৃতিত্বের বিষয় নহে। এই জাতীয় খুঁটি-নাটি বিষয়ের এলেম বড়দের তুলনায় ছোটদেরও বেশী হইতে পারে।

বালেগ হওয়ার পর খৎনা করা

বালেগ হওয়ার পর খৎনা করার অনুমতি আছে। তবে শর্ত হইল (চামড়া শক্ত হইয়া যাওয়ার কারণে যেই অতিরিক্ত ব্যথা হইবে উহা) সহ্য করার শক্তি থাকিতে হইবে। খৎনার প্রয়োজনে তাহার শরীর দেখা এবং হাত লাগানো জায়েজ আছে। (তবে যাহাদের এই কাজে কোন প্রয়োজন নাই তাহারা দেখিতে পারিবে না)।

কোন কোন সময় দেখা যায় বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে খৎনা করা হয়। এই বয়সের ছেলেদের খৎনার সময় খৎনার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার গুপ্তস্থান দেখা হারাম। অথচ এই সময় অনেকেই নির্দ্বিধায় তাকাইয়া দেখে এবং গোনাহগার হয়।

খৎনা উপলক্ষে প্রদত্ত দ্রব্যের মাসআলা

খৎনা বা এই জাতীয় অনুষ্ঠানে বাচ্চাদেরকে যাহাকিছুই দেওয়া হয়, প্রকৃত অর্থে উহা কিন্তু ঐ বাচ্চাকে দেওয়া হয় না। বরং বাচ্চাকে উপলক্ষ করিয়া তাহার মাতাপিতাকেই দেওয়া হয়। সুতরাং মাতাপিতাকেই ঐ সকল দ্রব্যের মালিক মনে করা হইবে। তাহারা নিজেদের ইচ্ছা মতই উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। অবশ্য কেহ যদি নির্দিষ্টভাবে ঐ বাচ্চাকেই উহা দিয়া থাকে তবে এই ক্ষেত্রে তাহাকেই উহার মালিক মনে করিতে হইবে। বাচ্চা যদি বুঝমান হয়, তবে উহার মালিক হওয়ার জন্য সে নিজে উহা গ্রহণ করাই যথেষ্ট হইবে। আর বাচ্চা যদি নিজে উহা গ্রহণ না করে বা গ্রহণ করার উপযুক্ত না হয় তবে তাহার পক্ষ হইতে তাহার পিতা এবং পিতা না থাকিলে দাদা গ্রহণ করিলেই বাচ্চা উহার মালিক হইয়া যাইবে। যদি বাপ-দাদা কেহই না থাকে তবে সে যেই ব্যক্তির প্রযত্নে প্রতিপালিত হইতেছে সে গ্রহণ করিবে।

মেয়েদের নাক ছিদ্র করা

জেওর-অলঙ্কার ব্যবহারের প্রয়োজনে মেয়েরা যে কোন কষ্টই হাসি মুখে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত। অলঙ্কার ব্যবহারের জন্য কান ছিদ্র করিতে হয়, উহাতে ভয়ানক কষ্টও হয় বটে, কিন্তু তাহারা এই কষ্টকে কিছুই মনে করে না, বরং হাসি মুখেই উহার সকল কষ্ট সহ্য করিয়া লইতেছে। যদি কাহাকেও বলা হয় যে, কান ছিদ্র করিয়া কি কারণে এত কষ্ট করিবে? বরং এই ভাবেই থাক– তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উপর চড়াও হইয়া আসিবে।

আমার এক দোস্ত নিজের কন্যাকে খুব ভালবাসিতেন। কন্যার কোন কষ্টই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যদি আমার কন্যার কান ছিদ্র না করি তবে কি আমার কোন অপরাধ হইবে? জবাবে আমি তাহাকে বলিলাম, কান ছিদ্র না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। আমার এই মন্তব্য ঐ বালিকার কানে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার উপর ভিষণভাবে চটিয়া গেল যে, নিজের বিবি-বহিনদের খবর নাই; মাসআলাটি যেন কেবল আমার জন্যই আবিষ্কার হইয়াছে।

এক ব্যক্তি নাক ছিদ্র করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, দোররে মোখতার প্রণেতা লিখিয়াছেন– এই বিষয়ে আমি পরিষ্কার কিছুই পাই নাই। আর শামী নাককে কানের সঙ্গে কেয়াস করিয়া উহা জায়েজ বলিয়াছেন। অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে নাক ও কান যেহেতু সমপর্যায়ভুক্ত এবং কানের কথা যেহেতু উল্লেখ আছে, সুতরাং উহার উপর কেয়াস করিয়া নাক ছিদ্র করাও জায়েজ বলা হইয়াছে। তবে নাক ছিদ্র করা উত্তম নহে।

সন্তানাদির জন্য দোয়া করা

আপন সন্তানাদির জন্য দোয়া করা প্রসঙ্গে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। স্বয়ং তিনি নিজে সন্তানের পার্থিব কল্যাণ কামনা করিয়া দোয়া করিয়াছেন। যেমন বলা হইয়াছে–

و ارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله و اليوم الاخر

অর্থঃ এবং ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও কেয়ামত বিশ্বাস করে তাহাদেরকে ফলের দ্বারা রিজিক দান কর।

অনুরূপভাবে ধর্মীয় কল্যাণের দোয়ায় বলা হইয়াছে–

ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليه ايتك و يعلمهم الكتب و الحكمة و
يزكيهم، انك انت العزيز الحكيم *

অর্থঃ হে পরওয়ারদিগার! তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন– যিনি তাহাদের নিকট তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিবেন। তাহাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবেন। নিশ্চয়ই তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যেমন পার্থিব বিষয়ে দোয়া করিয়াছেন, অনুরূপভাবে ধর্মীয় বিষয়েও দোয়া করিয়াছেন। তিনি যেন নিজ আওলাদদের জন্য দোয়া করিয়া আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, নিজের সন্তানদের জন্য দুনিয়ার তুলানয় দ্বীনের গুরুত্ব বেশী দিবে। আর আওলাদ (বা সন্তানাদি) এখানে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রকৃত আওলাদ হউক বা ধর্মীয় আওলাদ। তাছাড়া 'আওলাদ' তখনই প্রকৃত আওলাদে পরিণত হয় যখন সে যথাযথভাবে আনুগত্য করে যেমন নবীদের আনুগত্য করার পরই তাঁহাদের মকবুল আওলাদ হওয়া যায়।

এক্ষণে আমাদের ইহা তলাইয়া দেখা আবশ্যক যে, আমরা নিজেদের

আওলাদ-ফরজন্দের ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামের আদর্শ ও তরীকা কতটুকু অনুসরণ করিতেছি। আমি এই কথা বলি না যে, লোকেরা তাহাদের আওলাদের হক আদায় করে না, অবশ্যই করে। তবে এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মানুষ এই বিষয়ে দুনিয়াকেই অগ্রাধিকার দিতেছে। নিজের সন্তানাদিকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ কামাই করার পথ ধরাইয়া দিতে পারিলেই মনে করা হয় যে, আমরা তাহাদের হক আদায় করিয়াছি। বাকী তাহাদের আমল-আখলাকের যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তবে উহার এছলাহ তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে। অর্থাৎ মানুষের অন্তরে দ্বীনের গুরুত্ব না থাকার কারণেই এইভাবে দুনিয়ার প্রতি ঝুকিয়া পড়িতেছে।

নেক সন্তান কামনা করিয়া দোয়া

নেক সন্তান কামনা করা এবং খারাপ সন্তান হইতে বাঁচিয়া থাকার কতিপয় দোয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল–

رب اجعلنى مقيم الصلوة و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء

অর্থঃ আয় পরওয়ারদিগার! আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামাজ কায়েম করিবার শক্তি দান করুন। আয় আল্লাহ! আমার দোয়া কবুল করুন।

ربنا هب لنا من ازواجنا و ذريتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين اماما *

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদের স্ত্রী ও বংশধর হইতে এমন মানুষ দান কর; যাহাদের কারণে আমাদের চক্ষু শীতল হয়, এবং আমাদিগকে ধর্মানুরাগী মানুষের নেতা বানাইও।

اللهم اصلح لى فى ذريتى انى تبت إليك و انى من المسلمين *

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাকে আমার বংশধরসহ সংশোধন কর, আমি তওবা করতঃ তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি এবং আমি মুসলমানদের দলভুক্ত আছি।

الله بارك لنا فى ازواجنا و ذريتنا و تب علينا انك انت التواب الرحيم *

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদের স্ত্রী ও বংশধরে বরকত দান কর, এবং আমাদের তওবা কবুল কর। কেননা, তুমিই তওবা কবুলকারী।

اللهم انى اسئلك من صالح ما تؤتى الناس من المال و الاهل و الولد غير ضال و لا مضل *

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উত্তম বস্তু প্রার্থনা করিতেছি তাহা ধন-সম্পদ, স্ত্রী কিংবা সন্তানাদি। যেন গোমরাহ এবং গোমরাহ করনেওয়ালা না হই।

اللهم انى اعوذ بك من ولد يكون على و بالا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন সন্তান হইতে পানাহ চাইতেছি যাহা আমার জন্য মুসীবতের কারণ হইবে।

তরবিয়তের বিবরণ

নেক সন্তান লাভের উপায়

মায়ের কোলে প্রতিপালনের মাধ্যমেই মানুষের পার্থিব জীবনের সূচনা হয়। এই সময়ই মায়ের আখলাক-চরিত্র ও স্বভাব-প্রকৃতি শিশুর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। সেই কচি বয়সে তাহাদের কোন বোধশক্তি না হইলেও তাহারা যাহা দেখে ও শোনে উহাই তাহাদের কোমল মানসপটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই কারণেই শিশুদের সামনেও কোন প্রকার অসঙ্গত আচরণ করিতে নাই।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ এমনও লিখিয়াছেন, জননীর আচার-আচরণের প্রভাব তাহার উদরস্থ সন্তানের উপরও প্রতিফলিত হয়। সুতরাং গর্ভবতী মহিলাদের পক্ষে তাক্ওয়া-তাহারাত, পরহেজগারী ও নেক আমলে বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

উদরস্থ সন্তানের উপরই যদি আমাদের নেক আমল ও বদ আমলের প্রভাব পড়ে, তবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তান যখন সকল কিছু দেখিতে-শুনিতে পাইবে তখন তো আরো ভালভাবেই মাতাপিতার আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হইবে।

বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন, শিশুদের হৃদয় হইল ছাপাখানার মত। যাহা যাহা সে দেখে ও শোনে উহার সকল কিছুই তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই কারণেই শিশুকে নেক ও চরিত্রবান রূপে গড়িয়া তোলার লক্ষে প্রথমে তাহার মাতাপিতাকেই নেক ও চরিত্রবান হইতে হইবে। কারণ শৈশবে তাহার হৃদয়ে যাহা অঙ্কিত হইবে, পরিণত বয়সে উহাই তাহার চরিত্রে বিকশিত হইবে।

অনেকে এইরূপ ধারণা করিয়া থাকে যে, একান্ত কচি বয়সের শিশুরা তো আর ভাল-মন্দ কিছুই বুঝে না সুতরাং এই সময় কোন সাধারণ শিক্ষকের নিকটই তাহাদের প্রাথমিক পাঠ চলিতে পারে। পরে যখন জ্ঞান-বুদ্ধি হইবে

তখন কোন হুশিয়ার ও পরহেজগার উস্তাদের হাওয়ালা করিলেই চলিবে।

কিন্তু ভাইসকল! উপরোক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে কথা ফুটিবার পূর্বেই তাহার দেমাগ কাজ করিতে শুরু করে। সে যাহা দেখে ও শোনে উহার সকল কিছুই তাহার হৃদয়ে ছবির মত অঙ্কিত হইয়া থাকে। টেপরেকর্ডার যখন মানুষের কথা ধারণ করে, তখন সে নীরব থাকে বটে, অবোধ শিশুর মত নীরব-নির্বাকেই সে মানুষের কথা অন্তরে ধারণ করিয়া রাখে। পরে যথাসময় যখন সুইচ অন করা হইবে, অর্থাৎ শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তখন পূর্বেকার শোনা সকল কিছুই তাহার মাধ্যমে হুবহু প্রকাশ পাইবে।

শিশুর চরিত্রগঠন সম্পর্কে জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন– পাঁচ বৎসর বয়সের ভিতরই শিশুর চরিত্র ভাল কি মন্দ উহা নির্নিত হইয়া যায়। এই সময়সীমার মধ্যে তাহার অবচেতন হৃদয়-মন যাহা ধারণ করে উহাই তাহার চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর আর কোন অসঙ্গত-অভ্যাসই তাহার চরিত্রে সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং এই পর্যালোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে– যেই বয়সটিকে আমরা একান্তই অবুঝ, কর্মহীন এবং কোলে-কাখে ও দোলনায় বিচরণের সময় মনে করিতেছি, উহাই হইল শিশুর চরিত্র গঠনের মূল সময়। শিশুর অবুঝ হৃদয় এই সময় যাহা ধারণ করিয়া রাখে, পরিণত বয়সে উহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার মানব-চরিত্র গড়িয়া ওঠে।

কেহ বলিয়াছেন, শিশুদের এছলাহ ও সংশোধনের সহজ উপায় হইল– উত্তমরূপে বড় সন্তানের এছলাহ্ করিয়া দেওয়া। অতঃপর তাহার দেখাদেখি ছোটরাও উত্তম চরিত্রে অভ্যস্ত হইতে থাকিবে।

শৈশব কাটাইয়া বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে অতীব যত্নের সহিত দ্বীনী এলেম শিক্ষা দিবে এবং শরীয়ত বিরুদ্ধ ক্রিয়া-কর্ম হইতে হেফাজতে রাখিবে। নেক ও চরিত্রবান ব্যক্তিদের সংশ্রবে থাকিতে দিবে এবং দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যেন মিশিতে না পারে এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে।

মোটকথা, বুজুর্গানে দ্বীনের নিয়ম-তরীকায় শিশুদের তা'লীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। মহিলারা এই বিষয়ে যথেষ্ট ত্রুটি করিয়া থাকে। অথচ তাহাদের সযত্ন তরবিয়তের মাধ্যমেই শিশুদের চরিত্রগঠন সহজভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। কারণ, শিশুদের বয়সের সিংহভাগটাই কাটে নারীদের সঙ্গে। তবে এই কথাও সত্য যে, শিশুদের শিক্ষা-দিক্ষার জন্য এককভাবে নারীরাই দায়ী নহে, বরং এই বিষয়ে পুরুষদেরও দায়িত্ব রহিয়াছে।

শিশুদের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন

মানুষের জন্য আবশ্যকীয় এলেম হইল দ্বীনের এলেম (এই এলেমের কিছু কিছু বুনিয়াদী বিষয় শিশুরা মায়ের নিকটই শিক্ষা করিবে)। শিশুকে সর্বপ্রথম কালেমা শরীফ শিক্ষা দিবে। যেই কালেমাটি সহজে শিক্ষা দেওয়া যায়, প্রথমে উহাই শিক্ষা দিবে। যেমন– আল্লাহ পাকই সকল কিছু পয়দা করিয়াছেন, তিনি সকল কিছু জানেন, তিনিই সকলের রিজিক দেন– ইত্যাদি। এইভাবে শিশুকে আল্লাহ পাকের গুণাবলী শিক্ষা দিবে এবং তাহার নিকটই সকল কিছু প্রার্থনা করিতে বলিবে। শিশুরা দুষ্টামি করিলে তাহাদিগকে বলিবে, এইরূপ করিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হইবেন।

মোটকথা, শিশুদের জন্য সহজবোধ্য বিষয়গুলির দুই একটি করিয়া বার বার বলিতে থাকিলে ক্রমে উহাতে তাহাদের এক্বীন পয়দা হইতে থাকিবে। শিশু বয়সেই তাহাদের ধ্যান-ধারণায় সঠিক বিষয়গুলি বসাইয়া দেওয়া নারীদের কর্তব্য। তাহাদের পক্ষেই এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

অতঃপর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে কোরআন শরীফের ছোট ছোট সুরাগুলি মুখস্থ করাইতে থাকিবে। সাত বৎসর বয়স হওয়ার পর নামাজের তা'লীম দিবে। আর দশ বৎসর বয়সে নামাজ না পড়িলে শাসন করিবে। অর্থাৎ শৈশব হইতেই তাহাদিগকে নামাজে অভ্যস্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবে।

ছেলেমেয়ে বড় হওয়ার পর এলমে দ্বীন শিক্ষা দিবে। পূর্ণ কোরআন শরীফ শিখানো সম্ভব না হইলে অন্ততঃ এক মঞ্জিল হইলেও শিক্ষা দিবে। শেষের দিকের সুরাগুলি জানা থাকিলে নামাজ আদায়ে অনেক সুবিধা হয়। তাছাড়া পবিত্র কোরআনের প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশ নেকী তো আছেই।

অনেক সময় দেখা যায়– মহিলারা নিজেরা নামাজ আদায় করে বটে, কিন্তু ঘরের ছেলেমেয়ে এবং চাকর-চাকরানীদের নামাজের বিষয়ে তাহারা কিছুই বলে না। শিশুরা যেহেতু মায়েদের কোলেই প্রতিপালিত হয়, সুতরাং তাহাদের আদত-আখলাক ও নামাজের অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়ে মায়েদেরই অধিক যত্নবান হইতে হইবে। ইহাতে কখনো অবহেলা করিবে না। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন, উন্নত চরিত্র ও নেক আমলের প্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। এদিকে মায়েরাই শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক যত্ন লইয়া থাকে। সুতরাং আমি এই ফায়দাও বলিয়া দিয়াছি যে, দ্বীনের বিষয়ে যত্নবান না হইলেও অন্ততঃ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হইলেও বাচ্চাদেরকে নামাজের তাকীদ করিবে।

অনুরূপভাবে ঘরের চাকরানীদেরকেও নামাজের জন্য তাকীদ করিতে হইবে। তাহারা তোমাদের অধীন, তোমরা বলিলে অবশ্যই উহাতে কাজ হইবে। আর এই বিষয়ে অবহেলা করিলে তোমাদেরকে জবাবদিহি করিতে হইবে। সুতরাং কাজের মেয়ে নিয়োগ করার পূর্বেই এইরূপ শর্ত করিয়া লইবে যে, আমাদের এখানে কাজ করিতে হইলে তোমাদিগকে নিয়মিত নামাজ পড়িতে হইবে। কোন ঘরে একজন বেনামাজী থাকিলেও সেই ঘরে আল্লাহর বে-রহমতী নাজিল হয়। অথচ মহিলারা এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করে না।

সাত বৎসর বয়সেই নামাজের জন্য তাকীদ করিবে

একবার আমার মনে এইরূপ ধারণা হইল যে, নামাজের ব্যাপারে হাদীসে পাকে যে বলা হইয়াছে– "বাচ্চাদের বয়স সাত বৎসর হইলে তাহাদেরকে নামাজের হুকুম করিবে"– এখানে সাত বৎসরের কথা এই কারণে বলা হইয়াছে, যেন তাহাদের পক্ষে নামাজ আদায় করা কষ্টসাধ্য না হয়। অন্যথায় সাত বৎসরের পূর্বেই অর্থাৎ কিছুটা হুশ-জ্ঞান হওয়ার পরই নামাজের অভ্যাস করানো যাইতে পারে।

উপরোক্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পরই আমি মাদ্রাসার হাফেজ সাহেবকে বলিয়া দিলাম, ছেলেদের বয়স সাত বৎসর হউক চাই না হউক, সকলকেই নামাজ পড়াইতে হইবে। পরে এইরূপ ব্যবস্থাই করা হইল। কিন্তু নামাজ শুরু করার পর দেখা গেল, একদিন সাত বৎসরের কম বয়সী এক বালক জায়নামাজেই প্রস্রাব করিয়া দিয়াছে। এই ঘটনার পরই আমার সাত বৎসরের হেকমত বুঝে আসিয়াছে। অর্থাৎ সাত বৎসর বয়সের পূর্বে বাচ্চাদের ভাল-মন্দ তমিজ করার যোগ্যতা পয়দা হয় না।

আসলে শরীয়তের প্রতিটি বিধানই এইরূপ যে, উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার পর যখন উহার ক্ষতির দিকগুলি সামনে আসে, তখনই উহার হেকমত ও তাৎপর্য বুঝে আসে। এই ঘটনা দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করিলে যেমন ক্ষতির শিকার হইতে হয়, অনুরূপভাবে শরীয়তের হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করিলেও উহা ক্ষতির কারণ হয়।

ছেলে মেয়েদের রোজার ব্যাপারে অবহেলা

অনেকে নিজেরা রোজা রাখে বটে, কিন্তু ছেলেমেয়েরা রোজা রাখার উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদেরকে রোজা রাখায় অভ্যস্ত করার চেষ্টা করে না। আর এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে জবাবে ছেলেমেয়েরা না বালেগ হওয়ার অজুহাত পেশ করা হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিবে, বাচ্চারা বালেগ না হইলে তাহাদের উপর রোজা রাখা ওয়াজিব হয় না বটে, কিন্তু উহার অর্থ ইহা নহে যে, অভিভাবকদের পক্ষেও বাচ্চাদেরকে রোজায় অভ্যস্ত করানো ওয়াজিব নহে। সুতরাং বালেগ হওয়ার পূর্বেই যেমন নামাজের জন্য তাকীদ করা জরুরী; এমনকি শরীয়ত এই ক্ষেত্রে শাসন করিতেও হুকুম করিয়াছে, অনুরূপভাবে রোজার ব্যাপারেও বালেগ হওয়ার পূর্বেই উহার অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে বলা হইয়াছে। ব্যবধান শুধু এতটুকু যে, নামাজের ব্যাপারে সাত বৎসরের নিয়ম রাখা হইয়াছে, আর রোজার ব্যাপারে বলা হইয়াছে– যখন রোজার কষ্ট সহ্য করার মত শক্তি-সাহস পয়দা হইবে তখন হইতেই উহার অভ্যাস করাইতে শুরু করিবে। অভিভাবকদের উপর ইহা ওয়াজিব। উহার কারণ হইল, কোন কাজ ধরিয়াই ষোলআনা পাবন্দির সহিত আদায় করা সম্ভব হয় না। বালেগ হওয়ার পরই যদি শরীয়তের যাবতীয় বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে বলা হয়, তবে একজন অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা কষ্টসাধ্য হইবে বটে।

এই কারণেই শরীয়ত পূর্ব হইতেই অল্প অল্প করিয়া আমলের অভ্যাস গড়িয়া তোলার বিধান অনুমোদন করিয়াছে, যেন বালেগ হওয়ার পর পুরাপুরীভাবে আমল করিতে কষ্ট না হয়। এই বিধানের উপর আমল করা অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব করা হইয়াছে। কারণ, অভিভাবকদের উপর উহা ওয়াজিব করা না হইলে এই বিধানের কিছুই গুরুত্ব হইত না।

শিশুদের দ্বারা রোজা রাখানো

অনেকেই সখ করিয়া নিতান্ত কম বয়সী বাচ্চাদের দ্বারা রোজা রাখাইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে– এতটুকুন বাচ্চার দ্বারা রোজা রাখাইতে পারার গর্ব প্রদর্শন এবং এই উপলক্ষে ইফতারীর অনুষ্ঠান। প্রথমতঃ এই কাজের মূল বুনিয়াদই ত্রুটিপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ এই সকল অনুষ্ঠানে এমন কিছু ক্রিয়াকর্ম প্রদর্শন করা হয়, যাহা দ্বারা কেবল গোনাহই বৃদ্ধি পায়।

একটি মর্মন্তুদ ঘটনা

কম বয়সী শিশুদের দ্বারা রোজা রাখানো প্রসঙ্গে একটি বেদনা দায়ক ঘটনা আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি সখ করিয়া তাহার শিশুসন্তানকে রোজা রাখাইল এবং এই উপলক্ষে সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইফতারীর আয়োজন করিয়া সকলকে দাওয়াত দিল।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের দীর্ঘ দিবস। (এই মওসুমে একটি শিশুর পক্ষে রোজা রাখা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু তবুও সে মুরব্বীদের কথা অনুযায়ী রোজা সুসম্পন্ন করিতে লাগিল।) আছরের নামাজ পর্যন্ত সে ক্ষুৎপিপাসার কঠিন যাতনা সহ্য করিয়াছে। কিন্তু উহার পর সে আর কিছুতেই নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু এদিকে তাহার পিতা নিজের শিশু-সন্তানের রোজা খোলা উপলক্ষে ইফ্তারীর বিপুল আয়োজনে মহাব্যস্ত। (কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এত আয়োজন এত উদ্যোগ, সে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে এক কঠিন পরিণতির দিকে আগাইতে লাগিল।)

পিপাসায় অতিষ্ঠ হইয়া একে একে সকলের নিকট সে এক ফোটা পানি চাহিল, কিন্তু কেহই তাহাকে পানি দিতে রাজী হইল না। কারণ, শিশুটির রোজা উপলক্ষেই তো এই বিপুল আয়োজন। সুতরাং সে রোজা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে তো তাহাদের সকল আয়োজন-উদ্যোগ এবং বিপুল অর্থ ব্যয়ে সংগৃহীত সকল ছামান বরবাদ হইবে। কিন্তু প্রচণ্ড পিপাসায় শিশুটি ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিল। (শেষের দিকে সে যেন আর কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিল না। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত সূর্যটা তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়া যাই যাই করিতেছে। পৃথিবী জুড়িয়া নামিতেছে অন্ধকার। শিশুটিও যেন অনুভব করিল- তাহার জীবন-প্রদীপটিও ক্রমে নিভিয়া যাইতেছে। কিন্তু তবুও তাহার বাঁচিয়া থাকিতে বড় সাধ! এক ফোটা পানির অভাবে সে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে আগাইতেছে, অথচ) তাহারই সম্মুখে, ঐ অদূরে বরফের ঠাণ্ডা পানি ও সুপেয় শরবতের সমারোহ। উহা দেখিয়া যেন তাহার পিপাসার আগুন আরো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। (অতঃপর সে নিজের দেহ-মনের সকল শক্তি একত্রিত করিয়া কোন ক্রমে সেই) ঠাণ্ডা পানির দিকে আগাইয়া গেল। (কিন্তু ততক্ষণে তাহার পানি পান করিবার শক্তিও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল)।

শীতল পানির মটকাটির নিকট যাওয়ার পর কোনক্রমে উহাকে জড়াইয়া ধরার সঙ্গে সঙ্গে চির দিনের জন্য তাহার দেহটিও শীতল হইয়া গেল- সে মৃত্যুবরণ করিল। শিশুর প্রাণহীন দেহটি যেন (ব্যঙ্গ করিয়া নির্বাক কণ্ঠে সহসা) বলিয়া উঠিল, ধন্য হউক তোমাদের অনুষ্ঠান-আয়োজন, তোমাদের ঐ সাজ-সরঞ্জামে আমার জীবন উৎসর্গ করিয়া দিলাম।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, এই বেদনা দায়ক ঘটনা এবং এই বাড়াবাড়ি ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য কি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দায়ী হইবে না?

বিসমিল্লাহ শুরু করা এবং মক্তবে পাঠানো

আজকাল শিশুকে বিসমিল্লাহ শুরু করানো বা মক্তবে পাঠানো উপলক্ষে বিবিধ রুসম-রেওয়াজ পালন করা হয়। যেমন শিশুর বয়স চার বৎসর চার মাস চার দিন পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে ছবক দেওয়া হয়। এই নিয়মকে এমন কঠোরভাবে পালন করা হয় যে, কোন অবস্থাতেই যেন উহার ব্যাতিক্রম হইতে না পারে এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এই নিয়ম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং শরীয়তে উহার কোন উল্লেখ নাই। অথচ জাহেল লোকেরা উহাকে শরীয়তের বিধান মনে করিয়াই পালন করিতেছে। উহার ফলে তাহাদের আকীদা নষ্ট হইতেছে এবং শরীয়ত বহির্ভূত একটি বিষয়কে শরীয়তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার অপরাধে লিপ্ত হইতেছে।

শিশুকে মক্তবে পাঠানো বা ছবক শুরু করার দিন নেহায়েত পাবন্দির সহিত মিষ্টির আয়োজন করা হয়। নিজের সঙ্গতি না থাকিলেও যে কোন উপায়েই হউক উহার আয়োজন করিতেই হইবে, অন্যথায় দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে যাহা করা হয় উহা নিছক সুখ্যাতি ও মানুষের বাহবাহ্ পাওয়ার নিয়তেই করা হয়- যাহা পরিষ্কার গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই ক্ষেত্রে নিয়ম হইল- শিশু যখন কথা বলিতে শুরু করে তখন তাহাকে কালেমা শিক্ষা দিবে এবং যথাসময় কোন বুজুর্গ আলেমের দ্বারা দোয়া করাইয়া বিস্‌মিল্লাহ শুরু করাইবে এবং মক্তবে পাঠাইতে থাকিবে। যদি মনে চায় তবে এই নেয়মতের শুকরিয়া হিসাবে কোন প্রকার রুসম-রেওয়াজের পাবন্দি না করিয়া নিজের তওফীক অনুযায়ী গোপনে কিছু দান-খয়রাত করিয়া দিবে। কিন্তু মানুষকে দেখাইয়া কিছুই করিবে না।

অনুরূপভাবে কোরআন শরীফ খতম করা উপলক্ষেও উপরোক্ত নিয়মেই কিছু রুসম-রেওয়াজের পাবন্দি করা হয়। এই ক্ষেত্রেও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে লোকজন জড়ো করিয়া খানাপিনার আয়োজন ও হাদিয়া-তোহফার ব্যবস্থা করা হয়।

শিশুর শিক্ষার বয়স

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত বৎসর বয়সে শিশুদের নামাজ শুরু করাইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহার উপর ভিত্তি করিয়াই আমি মনে করি, সাত বৎসর বয়সই শিশুর শিক্ষা শুরু করার উপযুক্ত সময়। তবে মৌখিকভাবে দোয়া-কালেমা ইত্যাদি সাত বৎসরের আগেও শুরু করা যাইতে পারে।

কিন্তু আজকাল লোকেরা নিজেদের পক্ষ হইতেই শিশুকে প্রথম পাঠ দানের সময় হিসাবে চার বৎসর চারমাস চার দিন বয়সকে "সুনির্দিষ্ট সময়" হিসাবে নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছে। ইহা শরীয়ত সম্মত নহে এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

শিক্ষার পদ্ধতি

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে নামাজের সুরা এবং মৌখিকভাবে দোয়া-কালাম শিক্ষা দিয়া নামাজ পড়াইতে শুরু করিবে। বালিকাদেরকে পর্দার ভিতরে রাখিয়াই এই সকল শিক্ষা দিবে। যখন পড়ার বয়স হইবে তখন কোন ভাল মক্তব ও দ্বীনদার-পরহেজগার এবং স্নেহপরায়ন উস্তাদের নিকট পাঠাইবে। মেয়েদেরকে বালিকা মক্তবে পাঠাইবে। কিন্তু বর্তমানে যেই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রচলন শুরু হইয়াছে ঐগুলির পরিবেশ ভাল নহে, সুতরাং বাচ্চাদেরকে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে পাঠাইবে না।

সর্বপ্রথম বাচ্চাদেরকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিবে। যদি মেধাশক্তি ভাল থাকে তবে কোরআন শরীফ হেফজ করানো উত্তম। অন্যথায় শুধু নাজেরা পড়াইবে। তবে সকল অবস্থাতেই এমন উস্তাদের নিকট পাঠাইবে যিনি বিশুদ্ধরূপে কোরআন শিক্ষা দিতে পারেন।

যদি হেফজ পড়ানো হয় তবে হেফজ শেষ হওয়ার পর এবং নাজেরা পড়াইলে কোরআন শরীফ অর্ধেক হওয়ার পর প্রতি দিন দ্বীনী কিতাবের একটি করিয়া ছবক শুরু করাইয়া দিবে। উহার পাশাপাশি কিছু অংক, হাতের লেখা এবং পত্র লিখন পদ্ধতিও শিক্ষা দিবে। দ্বীনদারীর উপর আমল করার ক্ষেত্রেও এই সকল বিষয় দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়।

আল্লাহ পাক যদি সুযোগ দেন তবে আরবী শিক্ষার মাধ্যমে আলেম বানাইয়া দিবে। কারণ এই জমানায় উহার প্রয়োজন সমধিক। অন্যথায় জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে কোন হালাল ও পবিত্র পেশা শিখাইয়া দিবে, যেন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে পেরেশান হইতে না হয়।

বয়স্ক ছেলেদেরকে সঙ্গে করিয়া আল্লাহ্ওয়ালাদের মজলিশে লইয়া যাইবে। তাঁহাদের ছোহ্বত ও নেক নজরের বরকতে দ্বীনের মধ্যে ছেলেদের মজবুতী আসিবে।

শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে জরুরী হেদায়েত

✯ পড়া-শোনার ব্যাপারে বাচ্চাদের অতিরিক্ত চাপ দিবে না। প্রাথমিক অবস্থায় তাহাদেরকে এক ঘন্টার বেশী আটকাইয়া রাখিবে না। অতঃপর ক্রমে তাহাদের শক্তি অনুযায়ী প্রয়োজন মত দুই ঘন্টা ও তিন ঘন্টা পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিয়া লইবে। সারা দিনই যেন লেখা পড়ার মধ্যে লাগাইয়া রাখা না হয়। উহার ফলে শিশুর স্বাস্থ্য, স্মরনশক্তি এবং পড়াশোনার আগ্রহে ভাটা পড়িয়া হিতে বিপরীত ফলাফল দেখা দিতে পারে।

✯ নিয়মিত ছুটি ছাড়া কঠিন প্রয়োজন না হইলে ঘন ঘন ছুটি দিবে না।

✯ প্রতিটি বিষয়ই এমন ব্যক্তির মাধ্যমে শিক্ষা দিবে, যিনি ঐ বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। অনেকে সস্তায় শিক্ষক রাখিয়া তাহাদের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। উহার ফলে অনেক সময় দেখা যায়– শিশুরা শুরুতেই অশুদ্ধ পঠন শিখিয়া ফেলে এবং পরে উহা আর সংশোধন করা যায় না।

✯ কঠিন পাঠসমূহ সর্বদা সকালে পড়িতে দিবে এবং সহজ পাঠগুলি বিকালে পড়াইবে। কারণ শেষের দিকে যখন ক্লান্তি আসিয়া পড়ে তখন কঠিন বিষয় পড়িতে দিলে উহা তাহাদের জন্য কষ্টকর হইবে।

✯ বাচ্চাদেরকে বিশেষতঃ মেয়েদেরকে পাক-প্রণালী ও সেলাই কর্ম শিক্ষা দিবে।

✯ মুসলমান শিশুদেরকে সর্বপ্রথম কোরআনের শিক্ষা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গিয়াছে, কচি বয়সে শিশুরা বিশেষ কোন বিদ্যাই শিক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং এই সুযোগেই তাহাদিগকে কোরআন শরীফ শিখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। অন্যথায় শিশুদের ঐ সময়টি বেকারই কাটিয়া যায়।

✯ শিশুদেরকে কেবল ধর্মীয় শিক্ষাই দিতে হইবে, চাই উহা উর্দূতেই (বাংলাদেশীদের জন্য বাংলাতে) কিংবা আরবীতে হউক। শুরুতেই ইংরেজী শিক্ষা দিবে না। কারণ, মানুষ প্রথমে যাহা শিক্ষা করে উহাই তাহার অন্তরে দাগ কাটিয়া যায়। এই কারণেই শিশুর চক্ষু খুলিবার পরই তাহাদেরকে ইংরেজী

শিক্ষা দেওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

সুতরাং প্রথমেই কোরআন শরীফ শিক্ষা দিবে। যদি পূর্ণ কোরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ দশ পারাই শিখাইয়া দিবে। আর প্রতি দিন যেন নিয়মিত তেলাওয়াত করা হয় উহার প্রতি নজর রাখিবে। উহার পাশাপাশি কোন আলেমের নিকট কিছু মাসায়েলের কিতাব শিখিতে দিবে। আর দ্বীনের খেলাফ যদি কোন আচরণ দেখা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তাম্বিহ করিবে।

মেয়েদেরকে দ্বীন ও পরকালের শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা

সাধারণতঃ মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শৈশব হইতে যে যেই স্বভাব-প্রকৃতিতে গড়িতে থাকে তাহাকে সেইভাবেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ভগ্নিগণ! তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে কি কারণে রান্নাবান্না ও সেলাইকর্ম শিক্ষা দাও? সেই সকল বিষয়েও তাহাদেরকে নিজেদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিলেই তো পার। অতঃপর দেখিতে পাইবে, বাস্তব জীবনে তাহারা কত কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হয়। অথচ এই পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানে কেহই চির দিন বসবাস করিবে না। মনে কর, কেহ না হয় একশত বৎসরই হায়াত পাইল। এই একশত বৎসরের জীবনে সে যদি রান্নাবান্না, সেলাই বা অন্য কোন হাতের কাজ নাও শিখে, তথাপি কোন প্রকার কষ্টে-সৃষ্টে তাহার এই শত বৎসরের জীবন কাটিয়াই যাইবে। কিন্তু আখেরাতের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। আখেরাতের ছামান ব্যতীত তথাকার জীবন কাটিবে না।

পরকালের জীবন হইল স্থায়ী। দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের জন্য যদি এতকিছু শিক্ষা করা জরুরী মনে করা হয়, তবে পরকালের অনন্ত-অসীম জীবনের জন্য তো হাজারো কিসিমের কাজ-কর্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল, দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের জন্য যেই পরিমাণ শিক্ষা-দিক্ষা ও কাজ-কর্ম শিখানো হয়, পরকালের জন্য সেই তুলনায় কিছুই করা হয় না। মোটকথা, মেয়েদেরকে পরকালের ব্যাপারে বেলাগাম ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

মেয়েদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার সহজ উপায় হইল– তাহাদিগকে ঐ সকল কিতাব পড়াইবে, যেইগুলিতে বিশেষভাবে মেয়েদের জরুরী মাসআলাসমূহ লেখা হইয়াছে। মেয়েদের হাতে কিতাব তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। সাধারণতঃ তাহাদের ফাহাম-সমঝ কম হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে সঠিক অর্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হইয়া বিভ্রাট ঘটানো অসম্ভব নহে।

সুতরাং কোন পুরুষ ঘরের মেয়েদেরকে একত্রিত করিয়া কিতাব পড়াইবে। যদি তাহারা পড়িতে না পারে, তবে নিজে কিতাব পড়িয়া বিষয়বস্তুগুলি ভালভাবে বুঝাইয়া দিবে। আর শুধু পড়াইলেই চলিবে না, বরং শিক্ষা শেষে তদনুযায়ী আমল করা হইতেছে কিনা এই বিষয়েও নেগরানী করিবে।

যদি কোন শিক্ষিতা মহিলা পাওয়া যায় তবে তাহার মাধ্যমেই মেয়েদেরকে কিতাব পড়ানো বা শোনানোর ব্যবস্থা করিবে। মোটকথা, যথাযথ উপায়ে মেয়েদেরকে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে এবং কোন অবস্থাতেই এই বিষয়ে অবহেলা করিবে না।

শিশুদের এছলাহ ও তরবিয়ত

★ বাচ্চাদেরকে শুরু হইতেই নিয়মিত মসজিদে গিয়া জামায়াতের সহিত নামাজ পড়িতে অভ্যাস করাইবে।

★ শৈশব হইতেই যেন মুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে কোন ত্রুটি না করে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। গরীব-মিসকীনদের সঙ্গে উঠা-বসা করিতে উৎসাহিত করিবে। গরীবদের সঙ্গে চলা ফিরা করিলে তাহারা তোমাদের কদর ও সম্মান করিবে। পক্ষান্তরে আমীর ও বিত্তবানদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলে উহাতে তোমাদের সম্মান বৃদ্ধি পাইবে না, তাহারা কখনো তোমাদেরকে ইজ্জতের নজরে দেখিবে না। সুতরাং শৈশব হইতেই বাচ্চাদেরকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলাফিরা করার উৎসাহ দিবে। শৈশবে এই সকল বিষয় অভ্যাস করানো যতটা সহজ বড় হওয়ার পর আর এতটা সহজ থাকে না।

★ বাচ্চারা যেন কখনো সুন্নতের খেলাফ কোন পোশাক এবং বিজাতীয়দের ফ্যাশন অনুকরণ না করে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

★ অন্য কোন কাজের ক্ষতি না হয় এমন একটি নির্দিষ্ট সময় বাহির করিয়া প্রতি দিন বাচ্চাদেরকে কোন দ্বীনী কিতাব পাঠ করিতে দিবে কিংবা নিজে পাঠ করিয়া শোনাইবে। শয়নের পূর্বে অল্প সময়ের জন্য এই আমলটি করা যাইতে পারে।

★ বাচ্চাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যখন বন্ধ হয় তখন দুই চারি দিনের জন্য তাহাদেরকে কোন আল্লাহওয়ালার ছোহ্বতে (কিংবা জামায়াতে) লইয়া যাইবে। ছুটির পূর্ণ দিনগুলি যদি এই কাজে ব্যয় করা সম্ভব না হয় তবে অর্ধেক ছুটি খেলাধুলার জন্য এবং অর্ধেক ছুটি এই কাজে ব্যয় করিবে।

মোটকথা, পাবন্দির সহিত নিয়মিত দ্বীনের আহকাম ও মাসায়েলের কিতাব পঠন এবং মাঝে-মধ্যে আল্লাহওয়ালাদের ছোহবত এখতিয়ারের ছেলছেলা জারী রাখিবে। শৈশব হইতেই যদি এই অভ্যাস করানো হয় তবে আসানীর সহিত উহাতে পাবন্দি আসিবে।

★ বাচ্চারা যদি কখনো মানুষের গীবত-শেকায়েত করে তবে স্বস্নেহে বুঝাইয়া বলিবে, মানুষের নিন্দা করা ভাল নয়, উহাতে পাপ হয়। অনুরূপভাবে অহংকার-তাকাব্বুরী ও মিথ্যা বলা হইতেও তাহাদেরকে বাধা দিবে। স্কুলে যদি জামায়াতের পাবন্দি না থাকে তবে বন্ধের সময় অবশ্যই তাহাদেরকে জামায়াতের পাবন্দি করাইবে।

★ বড় হওয়ার পর যদি লাগাতার দুই এক বৎসর কোন আল্লাহওয়ালার ছোহ্বতে থাকার সুযোগ হয় তবে খুবই ভাল। উহাতে তাহাদের আমল-আখলাকের অনেক ফায়দা হইবে। পূর্ণ বৎসরের সুযোগ না হইলে অন্ততঃ ছয় মাস, যদি উহাও না হয় তবে চল্লিশ দিন হইলেও এই কাজে ব্যয় করিবে। হাদীসে পাকে এই সংখ্যার বহু ফজিলত আসিয়াছে।

★ বাচ্চাদের মধ্যে যেন কখনো কোন বস্তুর লোভ পয়দা না হয় এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। উহার সহজ উপায় হইল– নিজের তওফীক অনুযায়ী তাহাদের পছন্দের বস্তুগুলি নিজেই আনিয়া খাইতে দিবে। আর বাচ্চারা জিদ করিলে কখনো উহা পূরণ করিবে না, যেন জিদ করার অভ্যাস ছুটিয়া যায় এবং ভবিষ্যতে আর কখনো উহা না করে।

★ শিশুদেরকে এমন অভ্যাস করাইবে যেন কোন খাবার বস্তু একা না খায়। বরং যাহা খাইবে সকলকে লইয়া মিলিয়া-মিশিয়া খাইবে। এই কারণেই তাহাদেরকে যখন কোন বস্তু দিবে (টাকা বা দ্রব্য) তখন উহার মালিক বানাইয়া দিবে না। কারণ, প্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদেরকে কোন কিছুর মালিক বানাইয়া দিলে অতঃপর আর উহা কাহাকেও দান করা বা হাদিয়া দেওয়া জায়েজ থাকে না। এই কারণেই তাহাদেরকে যাহা কিছুই দিবে কেবল ব্যবহার করা বা খাওয়ার আনুমতি দিবে, মালিক বানাইয়া দিবে না।

শিশুদের তরবিয়তের কতিপয় নিয়ম

★ শিশু কিছুটা জ্ঞান-বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম তাহাকে কালেমায়ে তাওহীদ শিক্ষা দিবে। অতঃপর ধীরে ধীরে তাহাকে জরুরী আদব সমূহ শিক্ষা

দিবে। সকলকে ছালাম করা, মিথ্যা না বলা এবং পর্দা ও হায়া-শরম ইত্যাদির তালীম দিবে।

★ ছেলেমেয়েদেরকে এক সঙ্গে খেলা করিতে দিবে না, উহাতে তাহারা ভবিষ্যতের বিবিধ অনিষ্ট হইতে হেফাজতে থাকিবে। শিশু যদি নিতান্ত অবুঝ হয় তবুও তাহাদের সামনে কোন অসঙ্গত আচরণ করিবে না। কেননা, তাহারা কিছু না বুঝিলেও ঐ আচরণের প্রতিচ্ছবি তাহাদের মানসপটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অতঃপর ভবিষ্যতে উহার আছর তাহাদের চরিত্রে প্রকাশ পায়।

★ বেশী হাসি-মজাক করিতে দিবে না, উহাতে ছেলেমেয়েদের চরিত্রে উশৃংখলতা পয়দা হয়।

★ ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার পর যেন পরস্পর দোস্তী করিতে না পারে তৎপ্রতি নজর রাখিবে। উহার মাধ্যমেই বিবিধ অনিষ্টের সূত্রপাত হয়। যদি তাহারা পরস্পর নির্দোষ খেলাধুলায় লিপ্ত হয় তবে নিকটে থাকিয়া নেগরানী করিবে যেন উহার সূত্র ধরিয়া পরে ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ না পায়।

★ ছেলেমেয়েরা কোন কাজই যেন গোপনে না করে উহার অভ্যাস করাইবে। কারণ, যেই সকল কর্ম মন্দ উহাই গোপনে করা হয়। সুতরাং এই অভ্যাস পয়দা হইতে দিবে না।

★ ছেলেমেয়েদেরকে এমন অভ্যাস করাইবে যেন কখনো অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন না করে। নিজের ত্রুটি ধরা পড়িবার পর প্রতিপক্ষ ছোট হইলেও অকপটে নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা করাইয়া লইবে। এই অভ্যাস নেহায়েত জরুরী। ইহাতেই দ্বীন-দুনিয়ার রাহাত ও শান্তি। যদি এইরূপ করা না হয় তবে মনের ভিতর অহংকার পয়দা হইয়া স্থায়ী অপমান ও জিল্লতির শিকার হইতে হয়।

সন্তান প্রতিপালনের নিয়ম

বেহেশ্তী জেওরের চতুর্থ খণ্ডে "সন্তান প্রতিপালনের নিয়ম" শিরোনামে এতদ্সংক্রান্ত কিছু জরুরী বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে ঐ আলোচনাটি হুবহু তুলিয়া ধরা হইল। এই শিরোনামের কিছু কিছু বিষয় হয়ত পিছনেও আলোচিত হইয়াছে, তবে যাহা জরুরী বিষয়, উহা বার বার আলোচনা করাতে কোন দোষ নাই।

ছোট বেলায় যেই আচার-আচরণ অভ্যাস করা হয়, পরবর্তী জীবনে উহাই

স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়। সুতরাং শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত যেই স্বভাবগুলি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, উহার কিছু কিছু নিম্নে প্রদত্ত হইল–

(১) যদি স্বীয় মাতা ব্যতীত অপর কাহারো দুধ পান করাইতে হয়, তবে দ্বীনদার-পরহেজগার মেয়েলোকের দুধ পান করাইবে। কেননা, মানব চরিত্রে গভীরভাবে দুধের প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

(২) মায়েরা সাধারণতঃ শিশুদেরকে পুলিশ বা অন্য কোন ভয়াল বস্তুর ভয় দেখাইয়া থাকে। ইহা ঠিক নহে। এইরূপ করিলে বাচ্চাদের দিল কমজোর হইয়া মানসিকভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে।

(৩) ছেলেমেয়েদের দুধপান ও খাওয়ার সময় নির্দিষ্ট করিয়া লইলে উহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

(৪) বাচ্চাদেরকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে, উহাতেও তাহাদের দেহ-মন সুস্থ থাকিবে।

(৫) ছেলেমেয়েদেরকে অতিরিক্ত সাজাইয়া-গুজাইয়া রাখিবে না।

(৬) ছেলেদের মাথার চুল বেশী লম্বা হইতে দিবে না।

(৭) মেয়েরা পর্দা করিবার পূর্বে তাহাদেরকে অলংকার পরিতে দিবে না। কারণ, উহার ফলে একে তো জান-মালের উপর আশংকা দেখা দেয়, তা ছাড়া অল্প বয়সেই জেওরের প্রতি আকর্ষণ হওয়া ভাল নহে।

(৮) ছেলেমেয়েদের হাতে গরীবদেরকে দান করার এবং ভাই-বোনসহ অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে খাবার জিনিস বিতরণ করার অভ্যাস করাইবে। উহাতে স্বভাবে দানশীলতা আসিয়া লোভের অভ্যাস হ্রাস পাইবে। অবশ্য তাহারা যেই সকল বস্তুর মালিক উহা অন্য কাহাকেও দিতে বলা জায়েজ নহে। তোমাদের নিজস্ব বস্তু তাহাদের দ্বারা দান করাইবে।

(৯) যাহারা বেশী খায় ছেলেমেয়েদের সামনে তাহাদের দুর্নাম করিবে। অবশ্য বর্ণনার সময় কাহারো নাম উচ্চারণ করিবে না। বরং এইরূপ বলিবে– যাহারা বেশী খায় লোকে তাহাদেরকে ঘৃণা করে। (ইহাতে ছেলেমেয়েদের কম খাওয়ার অভ্যাস হইবে)।

(১০) ছেলেদেরকে সাদা কাপড়ের অভ্যাস করাইবে এবং রঙ্গীন কাপড়ের নিন্দা করিয়া বলিবে, ইহা মেয়েদের পোশাক; তুমি তো পুরুষ, এইসব তোমার জন্য সাজে না।

(১১) মেয়েদেরকে অতিরিক্ত দামী পোশাক এবং বিলাসিতার অভ্যাস করাইবে না।

(১২) বাচ্চাদের সকল জিদ পূরণ করিবে না। উহাতে তাহাদের স্বভাব খারাপ হয়।

(১৩) বাচ্চাদেরকে চিৎকার করিয়া কথা বলিতে দিবে না। বিশেষতঃ মেয়েদেরকে তো খুবই তাকীদ করিবে। অন্যথায় বড় হইয়াও এই বদ-অভ্যাস থাকিয়া যাইবে।

(১৪) যেই সকল ছেলেমেয়েদের স্বভাব খারাপ এবং লেখা-পড়ায় অমনোযোগী, কিংবা যাহারা কেবল ভাল ভাল খাবার খাইয়া দামী পোশাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে অভ্যস্ত; এইরূপ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনো বাচ্চাদেরকে মিশিতে দিবে না।

(১৫) ক্রোধ, মিথ্যা, হিংসা, চুরি, পরনিন্দা, অকারণে নিজের কথার উপর জিদ করা অর্থহীন কথা বলা, অকারণে হাসা বা অতিরিক্ত হাসা, মানুষকে ধোকা দেওয়া, ভাল-মন্দ বিবেচনা না করা– ইত্যাদি অপরাধসমূহের প্রতি যেন ছেলেমেয়েদের আন্তরিক ঘৃণা জন্মে এইরূপ উপদেশ দিতে থাকিবে। কোন ত্রুটি দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করিবে এবং ভালভাবে বুঝাইয়া উপদেশ দিবে।

(১৬) ছেলেমেয়েরা অসাবধানতা বশতঃ যদি কোন জিনিস ভাঙ্গিয়া ফেলে বা নষ্ট করিয়া ফেলে, কিংবা অপর কাহাকেও যদি মারে বা গালি দেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিবে যেন ভবিষ্যতে আর এইরূপ না করে; এই সকল ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিলে তাহাদের স্বভাব চিরতরে খারাপ হইয়া যাইবে।

(১৭) ছেলেমেয়েদেরকে অসময়ে ঘুমাইতে দিবে না, (সময় মত ঘুমাইতে দিবে এবং সময় মত উঠাইবে)।

(১৮) বাচ্চাদেরকে ঘুম হইতে ভোরে যথাসময় উঠার অভ্যাস করাইবে।

(১৯) সাত বৎসর বয়স হইলে নামাজ পড়ার অভ্যাস করাইবে।

(২০) মক্তবে যাওয়ার বয়স হইলে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ পড়াইবে (নিতান্ত কম বয়সে অতিরিক্ত পড়ার চাপ দিবে না। উহার ফলে মেধা ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে)।

(২১) মক্তবে যাইতে না চাহিলে কখনো প্রশ্রয় বা ঢিল দিবে না। যেই প্রকারেই হউক নিয়মিত মক্তবে যাওয়ার অভ্যাস করাইবে।

(২২) শৈশবের শিক্ষা যেন দ্বীনদার পরহেজগার উস্তাদের নিকট হয় এই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখিবে।

(২৩) ছেলেমেয়েদেরকে মাঝে-মধ্যে আউলিয়া কেরামের ঘটনা শোনাইবে।

(২৪) ছেলেমেয়েদেরকে নভেল-নাটক বা প্রেমিক-প্রেমিকার গল্প এবং শরীয়ত বিরুদ্ধ কিচ্ছা-কাহিনী পড়িতে দিবে না।

(২৫) বাচ্চাদেরকে এইরূপ বিষয় পড়িতে দিবে, যাহাতে ধর্মজ্ঞান ও নৈতিক উপদেশ লাভ হয় এবং দুনিয়ার আবশ্যকীয় বিষয়াদিও জানা যায়।

(২৬) পড়া শেষে মক্তব হইতে ঘরে ফিরিবার পর তাহাকে কিছুক্ষণ খেলিতে দিবে। ইহাতে তাহার মনের এক ঘেয়েমী ও ক্লান্তি দূর হইবে। এমন খেলা খেলিতে দিবে যেন উহাতে কোন গোনাহ ও মিথ্যা বলার অবকাশ না হয়।

(২৭) কোন প্রকার বাজনা, বাঁশী বা আতশবাজী কিনিবার জন্য ছেলেমেয়েদেরকে পয়সা দিবে না।

(২৮) ছেলেমেয়েদেরকে খেল-তামাশা (যেমন– সিনেমা, যাত্রা ইত্যাদি) দেখিতে দিবে না।

(২৯) ছেলেমেয়েদেরকে এমন কোন হাতের কাজ অবশ্যই শিক্ষা দিবে, যাহা দ্বারা প্রয়োজনে হালাল রুজী উপার্জন করিয়া যেন নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিতে পারে।

(৩০) মেয়েদেরকে এই পরিমাণ লেখা শিখাইবে, যাহা দ্বারা আবশ্যকীয় হিসাব এবং চিঠি-পত্র লিখিতে পারে। উহার অতিরিক্ত শিখাইবার প্রয়োজন নাই।

(৩১) ছেলেমেয়েদেরকে যাবতীয় কাজ-কর্ম নিজ হাতে করার অভ্যাস করাইবে। যেন অকর্মা বা অলস হইতে না পারে। রাতে শয়নকালে নিজ হাতে বিছানা করিবে এবং সকালে উঠিয়া নিজ হাতে উহা গুটাইয়া রাখিবে। নিজের কাপড় নিজেই হেফাজত করিবে। কাপড়ের সেলাই খুলিয়া গেলে বা ছিঁড়িয়া গেলে নিজ হাতেই সেলাই করিয়া লইবে। ধোপানীর নিকট কাপড় নিজেই গুণিয়া দিয়া লিখিয়া রাখিবে এবং ফেরৎ লওয়ার সময় গুণিয়া লইবে।

(৩২) মেয়েদের জেওর অলংকার ঘুমাইবার পূর্বে এবং ঘুম হইতে উঠিয়া যেন ভালভাবে দেখিয়া লয় যে, ঠিক আছে কি-না, ইহার অভ্যাস করাইবে।

(৩৩) রান্না করা, সেলাই করা, চরকা ঘুরানো, ফুল-বুটা করা, কাপড় রং করা ইত্যাদি যেই সকল কাজ বাড়ীতে হয়, মেয়েদেরকে সেই সকল কাজ দেখিয়া দেখিয়া শিখিতে বলিবে।

(৩৪) ছেলেমেয়েরা যখন কোন ভাল কাজ করে, তখন তাহাদেরকে আদর করিয়া খুব সাবাস দিবে, বরং কিছু পুরস্কার দিলে আরো ভাল হয়। কারণ, ইহাতে ভাল কাজে তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে। যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন নির্জনে নিয়া বুঝাইবে যে, এমন কাজ করিলে সকলে তোমার নিন্দা করিবে এবং কেহই তোমাকে ভালবাসিবে না। ভাল ছেলেমেয়েরা এমন কাজ করে না। লোকে বলিবে ছোট লোকের সন্তান। গোনাহের কাজ করিলে দোজখের আগুনের ভয় দেখাইবে। এই সকল কথা নির্জনেই বুঝাইবে, যেন শরম ভাঙ্গিয়া একেবারেই বে-শরম হইয়া না যায়। উহার পরও যদি এইরূপ করে তবে কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করিবে।

(৩৫) ছেলেমেয়েদের অন্তরে পিতার আজমত ও ভয় পয়দা করা মায়ের কর্তব্য।

(৩৬) ছেলেমেয়েদের খাওয়া-লওয়া বা খেলা-ধুলা কোন কাজই গোপনে করিতে দিবে না। কারণ, তাহারা যেই কাজ গোপনে করে, সেই কাজ তাহাদের নিকট মন্দ বলিয়াই গোপনে করে। সুতরাং বাস্তবিকই যদি সেই কাজ মন্দ হয় তবে তো উহা করিতেই দিবে না। আর যদি উহা মন্দ না হয় তবে সকলের সম্মুখে করিতে আপত্তি কি?

(৩৭) ছেলেমেয়েদের দ্বারা নিয়মিত কোন পরিশ্রমের কাজ অবশ্যই করাইবে, যেন তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকে এবং কর্ম-প্রিয়তার অভ্যাস গড়িয়া উঠে। যেমন, ছেলেদের পক্ষে এক-আধ মাইল হাঁটা বা দৌড়ানো এবং মেয়েদের জাঁতা পেষা বা চরকা কাটা ইত্যাদি।

(৩৮) ছেলেমেয়েরা হাঁটার সময় যেন উপরের দিকে চাহিয়া বা (এদিক-ওদিক চাহিয়া) অতি তাড়াতাড়ি না হাঁটে ইহার তাকীদ দিবে।

(৩৯) ছেলেমেয়েদেরকে বিনয়-নম্র আচরণ শিক্ষা দিবে। কথায় বা কাজে কখনো গর্ব-অহংকার প্রকাশ করিতে দিবে না। এমনকি নিজের সমবয়স্কদের সঙ্গে বসিয়া নিজের বাড়ী-ঘর, বংশাবলী এবং নিজের বই-পুস্তক ও দোয়াত-কলমের প্রশংসা ও বড়াই করিতে দেখিলে নিষেধ করিবে।

(৪০) মাঝে-মধ্যে ছেলেমেয়েদেরকে নিজের ইচ্ছামত কিছু কিনিবার জন্য

দুই-চারটা টাকা দিবে। কিন্তু গোপনে কিনিবার অভ্যাস করিতে দিবে না।

(৪১) ছেলেমেয়েদেরকে পানাহার ও মজলিশে উঠা-বসার আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে।

কতিপয় জরুরী হেদায়েত

ছেলেমেয়েদেরকে অবশ্যই কায়িক পরিশ্রমের অভ্যাস করাইবে। বরং ছেলেদেরকে পরিমিত ব্যায়াম এবং মেয়েদেরকে জাঁতা পেষণ ও চরকা কাটার অভ্যাস করাইবে।

✱ যত অল্প বয়সে খৎনা করানো যায় ততই ভাল। উহাতে কষ্ট কম হয় এবং দ্রুত ঘা শুকাইয়া যায়।

✱ বাচ্চারা যেন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে উহা লক্ষ্য রাখিবে। হাত-মুখ ময়লা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করিয়া দিবে। তাহাদেরকে মাজন ও মেসওয়াক ব্যবহারের অভ্যাস করাইবে।

✱ যেই সকল ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে তাহাদেরকে সর্বদা কিছু স্নায়ুবিক শক্তি বর্দ্ধক পথ্য করাইবে।

✱ শিশুদেরকে অধিক হাসাইবার জন্য আদর করার ছলে উপরের দিকে নিক্ষেপ করিয়া খেলিও না, কিংবা জানালার মধ্য দিয়া ধরিও না, হয়ত পড়িয়া গিয়া হাসির স্থলে ফাঁসী হইয়া যাইতে পারে। অনুরূপভাবে শিশুদের পিছনে থাকিয়া হাসাইয়া হাসাইয়া দৌড়াইও না। হয়ত পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাঙ্গিতে পারে।

✱ সকল সময় ভাল খাওয়া-পরার অভ্যাস করিবে না। কারণ, মানুষের অবস্থা সকল সময় এক রকম থাকে না। যদি উহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়, তবে হয়ত এক সময় মুসীবতের শিকার হইতে হইবে।

✱ তোমার বাচ্চা যদি কাহারো সঙ্গে কোন অন্যায় আচরণ করে, তবে সেই ক্ষেত্রে তুমি নিজের সন্তানের পক্ষাবলম্বন করিও না। বিশেষতঃ নিজের বাচ্চার সম্মুখে এইরূপ করিলে তাহার স্বভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে অন্য মানুষের নিকট নিজের সন্তানাদির প্রশংসা করিবে না।

✱ নিজের শাগরিদ বা সন্তানাদিকে কখনো শক্ত লাঠি দিয়া প্রহার কিংবা লাথি-ঘুষি দিবে না। আল্লাহ না করুন– দেহের কোন নাজুক অংশে আঘাত লাগিলে হয়ত হিতে বিপরীত হইতে পারে। চেহারা এবং মুখমণ্ডলেও প্রহার করিবে না।

✱ মেয়েদেরকে বলিয়া দিবে যেন ছেলেদের সঙ্গে খেলা না করে। কারণ ইহাতে উভয়েরই স্বভাব নষ্ট হয়। ঘরে যদি অন্য কোন ছেলে আসে (যদি তাহার বয়স কমও হয়) তখন সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে।

✱ বাচ্চাদেরকে মাতাপিতা এবং দাদার নাম শিখাইয়া দিবে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে উহা স্মরণ আছে কিনা। উহার এক ফায়দা এই যে, আল্লাহ না করুন, যদি কখনো হারাইয়া যায়, তখন লোকেরা হয়ত মাতাপিতার পরিচয় জানিতে পারিলে জায়গামত পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে।

পরস্পর হকের বিবরণ

সন্তানের হক

মাতাপিতার উপর সন্তানের অনেক হক রহিয়াছে। সন্তানের চরিত্রগঠন এবং তাহাদিগকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া মাতাপিতার দায়িত্ব। বহু মাতাপিতা আপন সন্তানদিগকে বিবিধ নাজ-নেয়মত দ্বারা সযত্নে প্রতিপালন করে বটে, কিন্তু তাহাদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কোন দায়িত্ব পালন করে না।

ভাইসকল! শৈশবেই যদি ছেলেমেয়েদেরকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদান ও চরিত্র গঠন করা না হয়, তবে বড় হওয়ার পর উহার পরিণাম খুবই খারাপ হয়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليلم نارا *

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে দোজখ হইতে রক্ষা কর।

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন– পরিবারবর্গকে এলমে দ্বীন শিক্ষা দাও। – ইহা দ্বারা জানা গেল যে, নিজের বিবি-বাচ্চাকে দ্বীনের এলেম শিক্ষা দেওয়া ফরজ, অন্যথায় উহার পরিণতি হইবে দোজখ।

সন্তানের পার্থিব হক হইল, তাহাদেরকে এমন কাজ শিক্ষা দিবে যাহা দ্বারা দুনিয়াতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারে

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা তোমাদের ছেলেদেরকে

সাতার কাটা ও তীর নিক্ষেপ করা শিক্ষা দাও এবং মেয়েদেরকে চরকা কাটা শিক্ষা দাও। –বায়হাকী

হাদীসের অর্থ শুধু এই তিনটি কাজ শিক্ষা দেওয়াই নহে; বরং দুনিয়াতে জীবন যাপন করার এবং জাতীয়তা রক্ষা করার জন্য যেই সকল বিষয় আবশ্যক হইবে উহার সবই শিক্ষা দেওয়া অভিভাবকদের কর্তব্য।

দ্বীনদার-পরহেজগার এবং শালীন ও শরীফ মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিবে যেন নেক সন্তান পয়দা হয়। শৈশবে আন্তরিক মোহাব্বত ও ভালবাসার সহিত তাহাদের পরিচর্যা ও প্রতিপালন করিবে। সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা পোষণেরও বহু ফজিলত আসিয়াছে। দুধপানের জন্য যদি ধাত্রী নিয়োগ করিতে হয় তবে দ্বীনদার-পরহেজগার নারী ঠিক করিবে। কারণ, সন্তানের চরিত্রে দুধেরও আছর পড়ে। মেয়ে-সন্তান প্রতিপালনের অধিক ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদেরকে যত্ন করিতে কখনো অবহেলা করিবে না। ছেলেমেয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর উত্তম পাত্র-পাত্রী দেখিয়া তাহাদের বিবাহ দিবে। যদি মেয়ের স্বামী ইন্তেকাল করে তবে তাহার দ্বিতীয় বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে নিজের ঘরে যত্নের সহিত রাখিবে। তাহার জীবন ধারণে যাহা যাহা প্রয়োজন উহার সকল কিছু যোগাইয়া দিবে।

একটি ঘটনা

একবার এক ব্যক্তি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর দরবারে গিয়া নিজের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, সে আমার হক আদায় করে না। হযরত ওমর (রাঃ) এই বিষয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলে সে জবাব দিল, হে আমীরুল মোমেনীন! কেবল সন্তানের উপরই পিতার হক আছে না পিতার উপরও সন্তানের কিছু হক আছে?

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, পিতার উপরও সন্তানের কিছু হক আছে। ছেলেটি বলিল, আমি সেই সকল হকের বিবরণ শুনিতে চাই।

এইবার আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, পিতার উপর সন্তানের হক হইল–

✮ সুসন্তান লাভের উদ্দেশ্যে নেক ও পরহেজগার স্ত্রী গ্রহণ করা।

✮ সন্তান পয়দা হওয়ার পর ভাল দেখিয়া তাহার নাম রাখা (কেননা, ভাল নামের বরকতে ছেলের উপর ভাল আছর পড়ে)।

✮ শিশুর বয়স বৃদ্ধি পাইয়া তাহার হুশ-জ্ঞান হওয়ার পর তাহাকে আদব-তমিজ ও দ্বীনের এলেম শিক্ষা দেওয়া।

উপরোক্ত বিবরণ শুনিয়া ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আমার পিতা এই সকল হকের একটিও আদায় করে নাই। আমি পয়দা হওয়ার পর তিনি আমার এমন একটি নাম রাখিলেন, যাহার অর্থ হইল পায়খানার কীট। তিনি আমাকে দ্বীনী এলেমের একটি হরফও শিক্ষা দেন নাই।

এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর ভিষণ রাগ করিলেন এবং লোকটির অভিযোগ খারিজ করিয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন, আগে তুমি নিজের জুলুমের প্রতিকার কর, পরে ছেলের জুলুমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করিও। তুমি নিজেই ছেলের হক অধিক নষ্ট করিয়াছ। যাও, নিজের সন্তানের প্রতি কখনো এইরূপ আচরণ করিও না। মোটকথা, যথাযথভাবে সন্তানের হক আদায় না করিলে উহার পরিণতি খারাপ হইবেই।

একবার আমি কানপুরের জামে মসজিদে দেখিতে পাইলাম, এক ব্যক্তি (পয়সার বিনিময়ে) মসজিদে পানি তুলিতেছে। লোকেরা তাহাকে নবাব! নবাব! বলিয়া ডাকিতেছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লোকটির নামই হয়ত নবাব। পরে জানিতে পারিলাম, লোকটি আসলেই এক সময় নবাব ছিল এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া তাহার জমিদারী ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে (ছেলেমেয়েদের) বিলাসিতার কারণে তাহার সকল কিছু শেষ হইয়া বর্তমানে সে নিদারুণ দৈন্যদশায় দিন কাটাইতেছে। অর্থাৎ শৈশবে ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্রগঠন ও দ্বীনী এলেম শিক্ষা না দিলে এইরূপ পরিণতিই বরণ করিতে হয়।

ছেলেমেয়েদের স্বভাব নষ্ট হওয়ার কারণ

যেই সকল কারণে ছেলেমেয়েদের স্বভাব নষ্ট হয় উহার একটি হইল অতিরিক্ত আহলাদ। অনেক সময় দেখা যায়– বাচ্চারা হয়ত কাহাকেও গালি দিতেছে, অন্যায়ভাবে কাহাকেও আঘাত করিতেছে, কিন্তু অতিরিক্ত আদর-আহলাদের কারণেই তাহাদেরকে কিছুই বলা হইতেছে না। কিছু বলা তো দূরের কথা, কোন কোন মহিলা এইরূপ বাসনাও করে যে, আমার ছেলে যেন অপরকে গালি দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে।

কোন এক মহিলা এইরূপ মান্নত করিয়াছিল যে, আমার যদি একটি ছেলে

হয় এবং সে যদি মায়ের নামে গালি দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারে, তবে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে পাঁচ টাকার মিষ্টি বিতরণ করিব।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন; খোদ মায়ের চরিত্রই যদি এইরূপ হয় তবে তাহারা কেমন করিয়া সন্তানকে গালি দেওয়া হইতে বাধা দিবে? অনুরূপভাবে কোন কোন পিতা সন্তানের দ্বারা নিজের দাড়ি টানায় এবং নিজেকে গালি দেওয়ায়। এই ছেলেমেয়েরাই যখন বড় হয় তখন তাহারা নিজেদের পিতামাতাকে গালির মাধ্যমেই সম্বোধন করে। কোন কোন ছেলে তো এমন জল্লাদের মত আচরণ করে যে, স্ত্রীর মোকাবেলায় নিজের মাতাকে লাঠি দ্বারা পর্যন্ত আঘাত করে। এই সময় যেন শৈশবের সেই সকল বাসনা মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়।

আমাদের এলাকার এক উস্তাদ সম্পর্কে এইরূপ শোনা গিয়াছে যে, তিনি নিজের ছাত্রদেরকে অপর এক উস্তাদের নিকট পাঠাইয়া বলিতেন যে, তাহার মক্তবের বিছানা ও চাটাই ছিঁড়িয়া দিয়া আসিবে। এক্ষণে বলুন, যেই বাচ্চাদের শৈশব এইরূপ অবস্থায় কাটিবে, বড় হওয়ার পর কি তাহাদের চরিত্র সংশোধন করা সম্ভব হইবে? অথচ এই সকল বিষয়ের প্রতি মোটেও লক্ষ্য করা হইতেছে না। বরং অনেকেই বলিয়া থাকে, বাচ্চাদের স্বভাব তো কিছুটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ হইবেই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঔদ্ধত্য ও দুষ্টামি এক জিনিস নহে।

মানুষের স্বভাব হইল, সে যাহাদেরকে দেখে এবং যাহাদের সঙ্গে চলা-ফিরা করে তাহাদের স্বভাব-চরিত্রই নিজের মধ্যে ধারণ করে। অনেকে বলিয়া থাকে, বয়স হইলে কি আর বাচ্চাদের এই স্বভাব থাকিবে? তখন নিজের সংশোধন নিজেই করিয়া লইবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং প্রকৃত অবস্থা হইল- বাচ্চারা যখন কথাও বলিতে পারে না, সেই কচি বয়সেও তাহারা যাহা দেখে ও শোনে উহাই তাহাদের মানসপটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। বড় হওয়ার পর উহাই তাহাদের চরিত্রে প্রকাশ পায়।

চুরির অভ্যাস এক দিনে হয় না

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ চোরের উপর আল্লাহ পাক লা'নত বর্ষণ করুন যে, সে একটি ডিম চুরি করে আর উহার ফলে তাহার হস্ত কর্তন করা হয়।

উপরোক্ত হাদীসের উপর প্রশ্ন উঠে যে, আসলেই কি একটি ডিম বা একটি রশি চুরি করার দায়ে হাত কাটা হয়? হাত কাটার নেছাব তো উহা হইতে আরো বেশী (অর্থাৎ দশ দেরহাম)।

আমাদের উস্তাদ বলিতেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ হইলঃ সাধারণ চুরির মাধ্যমেই বড় ধরনের চুরির অভ্যাস পয়দা হয়। এক পয়সা দুই পয়সা করিয়া চুরি করিতে করিতে সাহস বৃদ্ধি পাইয়া যখন উহা অভ্যাসে পরিণত হয়, তখনই সে বড় ধরনের চুরি করে এবং পরিণতিতে হাত কাটার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এক সময় যেই ছেলেটি একটি ডিম কিংবা ক্ষুদ্র একটি রশি চুরি করিত, পরবর্তিতে শৈশবের সেই স্বভাবের সূত্র ধরিয়াই বড় ধরনের চুরি শুরু করে এবং তাহার উপর হাত কাটার হুকুম জারী হয়- ইহাই বর্ণিত হাদীসের মূল বক্তব্য।

ত্রুটিপূর্ণ প্রতিপালনের পরিণতি

আজকাল পিতামাতারা যেন নিজের সন্তানকে কসাই'র মত প্রতিপালন করে। অর্থাৎ কসাই যেমন তাহার পশুকে খুব ভালভাবে খাওয়াইয়া মোটা-তাজা করার পর ছুরির নীচে জবাই দেয়। অনুরূপভাবে আজকালকার পিতামাতাগণ তাহাদের সন্তানদিগকে ভাল ভাল খাওয়া-দাওয়া এবং আরাম-আয়েশের মধ্যে প্রতিপালন করে বটে, কিন্তু (দ্বীনের তা'লীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দিক্ষার অভাবে) পরবর্তীতে তাহারা জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হয়। আর এই ছেলেমেয়েদের কারণেই তাহাদের পিতামাতাকে আজাবের শিকার হইতে হয়। কারণ তাহাদের ত্রুটির কারণেই দুনিয়াতে তাহারা নামাজ-রোজা হইতে বে-খবর ছিল।

কোন কোন মাতাপিতাকে এইরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে দেখা যায় যে, আমরা তো বেশ নামাজের পাবন্দ। অথচ তাহাদের এই খবর নাই যে, কেয়ামতের দিন নিজের বেনামাজী সন্তানদের সঙ্গে তাহাদিগকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছেঃ তোমাদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিই দায়িত্বশীল ও জিম্মাদার, সকলকেই তাহার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

সন্তানের এছলাহ

বাচ্চাদের এছলাহ্ ও সংশোধনের জন্য আল্লাহওয়ালাদের ছোহবতও আবশ্যক। তাহাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করিয়া দিবে যে, এই সময় অমুক মসজিদে অমুক বুজুর্গের নিকট গিয়া বসিবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল আজকাল এই সকল বিষয়ের প্রতি মোটেও লক্ষ্য করা হয় না।

খেলা-ধুলা এবং আমোদ-ফুর্তি করার জন্য সময় বাহির করা যায় কিন্তু নিজের আমল-আখলাক দুরস্ত করার জন্য সময় পাওয়া যায় না।

যাহাই হউক, শহরে বা আশেপাশে যদি কোন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ পাওয়া না যায় তবে ছুটির সুযোগে তাহাদেরকে কোন বুজুর্গের খেদমতে পাঠাইয়া দিবে। এই সময় তাহাদের কোন কাজ থাকে না। দিনরাত কেবল ঘুরিয়া-ফিরিয়া সময় নষ্ট করে।

সন্তানকে নসীহত করার বিষয়টি বড় সূক্ষ্ম। নসীহত সাধারণতঃ দুইটি পক্ষ হইতেই হইয়া থাকে। হয় উস্তাদের পক্ষ হইতে, কিংবা পিতার পক্ষ হইতে। অন্য সকলের নসীহতের তুলনায় পিতার নসীহতের মধ্যে বেশ কিছুটা ফরক আছে। উস্তাদ হয়ত বিধিবদ্ধ নসীহত করিয়াই নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করিবেন।

পক্ষান্তরে পিতা কেবল নিয়মের নসীহত করিয়াই নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। বরং সন্তানকে নসীহত করার সময় তিনি এমন এমন উপায় অবলম্বন করিবেন এবং এমনভাবে কথা বলিবেন যেন তাহার মনের গভীরে গিয়া উহা ক্রিয়া করে। কারণ, তিনি আন্তরিকভাবেই ইহা কামনা করেন যেন তাহার সন্তানের এছলাহ ও সংশোধন হইয়া যায় এবং ইহাতে কোন প্রকার কমী-কুসুরী ও ত্রুটি না থাকে। এই ক্ষেত্রে পিতা যদি কোন কঠিন বিষয়ের প্রতিও ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে উহাও এমন সহজভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন ছেলে সহজেই উহার উপর আমল করিতে পারে। সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম শফকত ও মোহাব্বতের কারণেই পিতার পক্ষে এতটা আন্তরিক হওয়া সম্ভব হয়।

মোটকথা, শফকত ও মোহাব্বতের সঙ্গে যখন তরবিয়ত করা হইবে, তখনই সম্ভাব্য সকল দিক ছাড় দেওয়া এবং চরম ধৈর্যের সহিত এছলাহের সহজতর মাধ্যম উপস্থাপন করা সম্ভব হইবে।

সন্তানের ভরণ-পোষণ

মানুষের সন্তান (ছেলে হউক বা মেয়ে) নিম্ন বর্ণিত দুই অবস্থার যেকোন এক অবস্থার অবশ্যই বিরাজ করিবে–

প্রথমতঃ সন্তান হয়ত মালদার বা অর্থশালী হইবে। অর্থাৎ পিতার মিরাছ পাওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন উপায়ে সে হয়ত সম্পদের মালিক হইয়াছে। এই অবস্থায় তাহার ভরণ-পোষণ তাহার নিজের সম্পদ হইতেই ওয়াজিব

হইবে। মাতাপিতার দায়িত্ব কেবল উহার এন্তেজাম ও ব্যবস্থাপনার নেগরাণী করা।

দ্বিতীয় অবস্থা হইল– সন্তান অর্থশালী না হওয়া; আবার অর্থশালী না হওয়ার ক্ষেত্রেও দুই অবস্থা হইতে পারে। অর্থাৎ– বালেগ (পনের বৎসর বয়স) হওয়া কিংবা না বালেগ হওয়া।

বালেগ হওয়ার ক্ষেত্রেও আবার দুই ধরনের সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কামাই রোজগার করিতে পারা। এই অবস্থায় নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজের উপরই থাকিবে, মাতাপিতার উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হইল– কামাই-রোজগার করিতে অক্ষম হওয়া। এই অবস্থায় তাহার উপর নাবালেগের হুকুম প্রযোজ্য হইবে। নাবালেগের হুকুমের বিবরণ সামনে আসিতেছে।

সন্তান নাবালেগ হওয়ার ক্ষেত্রেও দুইটি ছুরত হইতে পারে। প্রথমতঃ তাহার পিতা জীবিত থাকা, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতা জীবিত না থাকা। পিতা জীবিত থাকিলে পিতার উপরই তাহার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থাকিবে। এই ক্ষেত্রে মায়ের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। তবে শিশুকে দুধ পান করানো দ্বীনদারী ও মানবিক বিবেচনায় মায়ের উপর ওয়াজিব বলিয়া ফতোয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু আইনতঃ এই বিষয়ে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে না। তবে সন্তান যদি অপর কাহারো দুধ পান না করে তবে এই ক্ষেত্রে তাহার উপর জোর খাটানো যাইবে।

পক্ষান্তরে নাবালেগ সন্তানের পিতা যদি জীবিত না থাকে তবে মাতার উপর তাহার ভরণ-পোষণও ওয়াজিব হইবে। আর এই অবস্থায় (অর্থাৎ নাবালেগ সন্তানের পিতা জীবিত না থাকা অবস্থায়) যদি তাহার নিকটাত্মীয়গণ জীবিত থাকে, তবে এই এতীমের প্রতিপালনের দায়িত্ব সকলের উপরই বন্টন হইবে।

সন্তানের বিবাহ ও পিতার কর্তব্য

প্রশ্ন ঃ বিশেষভাবে মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে কোন তাকীদপূর্ণ হুকুম আছে কি-না এবং এই ক্ষেত্রে বিলম্ব করা হইলে যদি কোন গোনাহ হয় তবে উহার পরিমাণ কি, কোরআন ও হাদীসের পৃথক প্রমাণ দ্বারা উহার জবাব দিন।

উত্তর ঃ বিবাহের তাকীদপূর্ণ হুকুম কোরআনেও আছে এবং হাদীছেও আছে। ঐ হুকুমে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই আমভাবে শামিল করা হইয়াছে। মেয়েদের

বিষয়টি বিশেষভাবেও উল্লেখ আছে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

و انكحوا الايامى منكم و الصلحين من عبادكم و امائكم، ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، و الله واسع عليم *

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা বিবাহহীন, তাহাদের বিবাহ সম্পাদন করিয়া দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যাহারা সৎকর্মপরায়ণ, তাহাদেরও। তাহারা যদি নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাহাদেরকে সচ্ছল করিয়া দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

আয়াতে বর্ণিত "আয়ামা" শব্দের অর্থ হইল "বিবাহহীন" চাই কুমারী হউক কিংবা পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল এমন। অনুরূপভাবে ঐ শব্দ দ্বারা ঐ সকল পুরুষকে বুঝানো হয় যাহাদের স্ত্রী নাই।

হাদীস দ্বারা প্রমাণ ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ হে আলী! তিনটি বিষয়ে কখনো বিলম্ব করিবে না। [এক] সময় হওয়ার পর নামাজ আদায় করিতে। [দুই] জানাজা প্রস্তুত হওয়ার পর উহার নামাজ আদায়ে। [তিন] উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী যোগার হওয়ার পর বিবাহহীন ছেলেমেয়েদের বিবাহ সম্পাদনে।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ কাহারো সন্তান হওয়ার পর (ছেলে হউক বা মেয়ে) তাহার কর্তব্য হইল সন্তানের ভাল নাম রাখা, তাহার তা'লীম-তারবিয়তের ব্যবস্থা করা, বালেগ হওয়ার পর বিবাহের ব্যবস্থা করা। বালেগ হওয়ার পর যদি তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করা না হয়, আর সে কোন গোনাহে লিপ্ত হয় তবে ঐ গোনাহ পিতার উপর বর্তাইবে।

আলোচিত বিবরণ দ্বারা যথাসময় ছেলেমেয়েদের বিবাহ সম্পাদনের বিষয়টি জরুরী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া গেল। আর জরুরী বিষয় তরক করা হইলে উহা আজাবের কারণ হইবে বটে।

শেষোক্ত হাদীস দ্বারা গোনাহের পরিমাণ সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, বিবাহে বিলম্ব করা হইলে সন্তানরা যেই গোনাহে লিপ্ত হইবে– চাই ঐ গোনাহ দৃষ্টির, কানের, জবানের কিংবা অন্তরেরই হউক; ঐ পরিমাণ গোনাহ পিতারও হইবে।

তরবিয়তের জন্য কঠোরতার আবশ্যকতা

বাচ্চাদের তা'লীম-তরবিয়তের জন্য অনেক সময় কঠোরতা ও শাসনেরও

প্রয়োজন হয়। অনেক সময় দেখা যায়– কোন কথা হয়ত নরম ভাষায় বলিলে উহা বাচ্চাদের মনে কোন আছর হয় না এবং বেশী দিন স্মরণও থাকে না। অথচ ঐ একই কথা যখন ছখ্‌তী ও শাসনের সুরে বলা হয়, তখন উহা তাহাদের মনে স্থায়ী ক্রিয়া করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তো দেখা যায়, কঠোরতা ব্যতীত তাহাদের এছলাহ করা সম্ভবই হয় না, এই অবস্থায় যদি কঠোরতা না করা হয় তবে উহা খেয়ানতের মধ্যেই শামিল হইবে।

কঠোরতা করা যদি দোষণীয় হইত তবে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা কখনো এই আচরণ প্রকাশ পাইত না। অথচ ক্ষেত্রবিশেষে তিনি কঠোর আচরণও করিয়াছেন। এই কঠোরতা বৈরীতার লক্ষণ নহে, বরং ইহা মোহাব্বত ও কল্যাণকামীতারই লক্ষণ। সন্তান যখন অন্যায়-অপরাধের পথে চালিত হয় তখন স্নেহপরায়ণ পিতার সঙ্গে তাহার বিরোধ হয় এবং স্নেহবশেই পিতা তাহাকে শাসনও করেন।

এমনিভাবে পরম স্নেহপরায়না মাতার সঙ্গেও সন্তানের বিরোধ হয়। অর্থাৎ কোন কোন সময় শিশু ইচ্ছামত নিজের পছন্দের খাবার খাইতে চাহিলে মাতা স্নেহবশেই তাহাকে ঐ খাবার হইতে বিরত রাখেন এবং এই ক্ষেত্রে শিশু জিদ করিলে প্রয়োজনে তাহাকে শাসনও করেন।

উপরোক্ত দুইটি উদাহরণেই দুই ধরনের ক্ষতি দৃষ্ট হয়। একটি গুরুতর এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও সাময়িক। মাতাপিতা নিজের সন্তানকে গুরুতর ক্ষতি হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই অপেক্ষাকৃত হাল্কা ক্ষতির পথটি অবলম্বন করেন। আর ইহা একটি স্বীকৃত বিধান যে, দুইটি ক্ষতিকর অবস্থার সম্মুখিন হইলে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির দিকটি গ্রহণ করাই বিধেয়। যেমন, সন্তান যখন বিপথগামী হইতে থাকে, তখন পিতা তাহাকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যেই প্রহার করে। এই প্রহারও সন্তানের জন্য ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক বটে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতির দিকটি হইল বিপথগামী হওয়ার ফলে সন্তানের জীবন বরবাদ হওয়া। এই কারণেই স্নেহপরায়ণ ও দূরদর্শী পিতা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির দিকটি অবলম্বন পূর্বক কঠিন বিপর্যয়ের হাত হইতে সন্তানকে রক্ষা করার প্রয়াস চালান।

অনুরূপভাবে স্নেহময়ী মাতা আপন সন্তানকে তাহার চাহিদা অনুযায়ী খাবার খাইতে দেন না। এখানেও দুইটি ক্ষতির দিক সুস্পষ্ট। সন্তানকে বিবিধ উপাদেয় ও মজাদার খাবার হইতে বিরত রাখা– স্থুল দৃষ্টিতে ক্ষতিকরই বটে। কিন্তু এই ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম ও সাময়িক। আর এই ক্ষেত্রে ভয়াবহ ক্ষতির দিকটি

হইল- ইচ্ছামত খাওয়ার ফলে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া কঠিন পরিণতির শিকার হওয়া। এই কারণেই দূরদর্শী মাতা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির পথ অবলম্বনপূর্বক স্বীয় আদরের সন্তানকে গুরুতর ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন।

শাস্তি দেওয়ার উত্তম পদ্ধতি

"তা'যীর" ঐ শাস্তিকে বলা হয় যাহা ছেলেমেয়েরা অপরাধ করিলে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং পরিমিত পর্যায়ে প্রদান করা হয়। এই শাস্তিরও বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি রহিয়াছে। যেমন- তিরস্কার করা, রাগ করা, কান মলিয়া দেওয়া, কড়া ভাষায় শাসাইয়া দেওয়া, আটক করিয়া রাখা, অর্থ দণ্ড দেওয়া এবং হাত বা বেত দ্বারা প্রহার করা।

বাচ্চাদের জন্য উত্তম শাস্তি হইল তাহাদের ছুটি-ছাটা বন্ধ করিয়া দেওয়া। এই শাস্তি তাহাদের উপর যথেষ্ট ক্রিয়া করিয়া থাকে। বাচ্চাদের জন্য আমি দুইটি শাস্তি নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। একটি হইল কান ধরানো (মুরাদাবাদে উহাকে মোরগ বানানো বলা হয়)। অপরটি হইল, ওঠা-বসা করা। এই শাস্তি দ্বারা চারিত্রিক এবং শারীরিক উভয়বিধ উপকার সাধন হয়।

বাচ্চাদেরকে শাস্তি দিলে আমার খুব কষ্ট হয়। নেহায়েত প্রয়োজন হইলে আমি তাহাদেরকে রশি দ্বারা প্রহার করিয়া থাকি। উহাতে হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ভয় থাকে না। বাচ্চাদের সাধারণ অপরাধের শাস্তি হিসাবে দুইটি থাপ্পড়ই যথেষ্ট।

আসলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য নহে। মূল উদ্দেশ্য হইল তাহার সংশোধন হওয়া। যখন ইহা জানা যাইবে যে, কঠোরতা ও শাস্তি দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হইতেছে না, তখন নরমী ও কোমলতার মাধ্যমে এছলাহ করার চেষ্টা করিবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেই ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয় উহা সহজসাধ্য নহে। কারণ, কাহাকেও অন্যায় করিতে দেখিয়া নীরবে উহা সহ্য করা সহজ বটে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহাকে বিনম্র ভাষায় তিরস্কার করা খুবই কঠিন। বিশেষতঃ অপরাধী যদি টেড়ামী করিতে থাকে তবে এই ক্ষেত্রে উহা আরো অধিক কঠিন হয়।

নিজের ঘরের ছেলেমেয়েদের কথা সকলেরই জানা আছে যে, তাহাদের এছলাহ কঠোরতার মাধ্যমে হইবে না কোমলতার মাধ্যমে হইবে। বার বার শুধু কঠোরতা করিতে থাকিলে উহা দ্বারা বিশেষ কোন ফায়দা হয় না।

আমি নিজেও মানুষের এছলাহের ক্ষেত্রে যেই কঠোরতা করিয়া থাকি, এখন হইতে আমিও উহা ত্যাগ করিব। কারণ, উহাতে কোন লাভ হয় না। এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঘরের লোকেরা যখন অপরাধ করিতে থাকিবে তখনকি তাহাদিগকে আজাদ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে (এবং কিছুই বলা হইবে না?) আমি বলিলাম- না, তাহাদিগকে নসীহত করিতে থাকিবে।

প্রসঙ্গঃ অধিক শাস্তি ও কঠোরতা

অধিক শাসন ও কঠোরতার ফল কখনো ভাল হয় না। যেই সকল ছেলেমেয়েকে উঠিতে-বসিতে লাথি-ঘুষি ও শাসনের মধ্যে রাখা হয় তাহাদের হায়া-শরম নষ্ট হইয়া যায় এবং পরে তাহারা আর কাহাকেও ভয় করে না। তাছাড়া আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, অধিক মার-ধর করিলে তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রেও বিশেষ কোন ফায়দা হয় না। বরং উহার ফলাফল খারাপই হইয়া থাকে।

অধিক প্রহার করিলে প্রথমতঃ বাচ্চাদের অঙ্গ দুর্বল হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ বাচ্চারা আতঙ্ক ও ভয়ে মুখস্থ পড়াও ভুলিয়া যায় এবং মার খাইতে খাইতে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ার পর লজ্জা-শরম ও ভয় ভাঙ্গিয়া যায়। অতঃপর কোন শাসনই তাহার উপর আর আছর হয় না। এই পর্যায়ে নির্লজ্জতা তাহার পক্ষে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয় এবং জীবনে আর কখনো তাহার স্বভাব হইতে এই ব্যাধি দূর করা সম্ভব হয় না।

এমন ভয়ানক শাস্তি দেওয়া ঠিক নহে যাহা বাচ্চারা সহ্য করিতে পারে না। যেমন- উত্তপ্ত রোদে দাঁড় করাইয়া রাখা বা লাঠি দ্বারা নির্দয়ভাবে প্রহার করা ইত্যাদি। অনেকে আবার কেহ অন্যায় করিল অপর কাহারো দ্বারা থাপ্পড় দেওয়ায়। কিন্তু আমি এইরূপ করিতে নিষেধ করি। এই নিয়ম ভাল নহে, উহার ফলে পরস্পরের মধ্যে দুশমনী পয়দা হয়।

এক ধরনের মাতাপিতাকে ছোট শিশুর সঙ্গেও ভিষণ রাগ করিতে দেখা যায়। বরং কোন কোন সময় তো এমনভাবে প্রহার করিতে থাকে, যেন কোন নির্দয় কসাই কোন প্রাণীকে প্রহার করিতেছে। এইভাবেই মাতাপিতারা বাচ্চাদের উপর জুলুম করিয়া থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখিবে, পিতা হওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, তুমি তাহার জানেরও মালিক হইয়া গিয়াছ। যদি তাহাই হইত তবে তো পিতা পুত্রকে বিক্রয়ও করিতে পারিত।

আল্লাহ পাক পিতাকে অনেক মর্যাদা দান করিয়াছেন। কিন্তু উহা এই জন্য

নহে যে, সে তাহার শিশু-সন্তানের মালিক হইয়া যাইবে এবং তাহাকে কষ্ট দিতে থাকিবে। বরং শিশুর সযত্ন প্রতিপালনই তাহার কর্তব্য। তবে হাঁ, এই প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে কোন কোন সময় তাহাকে শাস্তি দেওয়ারও প্রয়োজন হইতে পারে এবং উহার অনুমতিও দেওয়া হইয়াছে। তবে এই পরিমাণ শাস্তিই দিবে যাহা তাহার প্রতিপালন ও তরবিয়তের জন্য কল্যাণকর হইবে। উহার অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়ার অনুমতি নাই। অর্থাৎ– এমন শাস্তি দেওয়া যাইবে না যাহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। তা ছাড়া মাতাপিতার পক্ষ হইতে এই ধরনের কঠোরতা গোনাহ তো বটেই, সেই সঙ্গে উহা মানবতা ও স্বভাবসুলভ আচরণেরও পরিপন্থী। মাতাপিতাকে তো আল্লাহ পাক সন্তানের জন্য রহমত স্বরূপ পয়দা করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইতে এই ধরনের আচরণ প্রকাশ পাওয়ার অর্থ হইল তাহারা ন্যুনতম মানবতাবোধও বিসর্জন দিতেছে।

'জরবে ফাহেশ' (বা অতিরিক্ত শাস্তি) প্রদান করিতে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ নিষেধ করিয়াছেন। যেই প্রহার দ্বারা শরীরে দাগ বসিয়া যায় ফকীহগণ উহাকেও জরবে ফাহেশের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। আর যেই প্রহার দ্বারা হাড় ভাঙ্গিয়া যায় কিংবা চামড়া ফাটিয়া যায় উহা তো আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। জরবে ফাহেশ বা অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করিলে খোদ উস্তাদ ও মাতাপিতাকে সাজা ভোগ করিতে হইবে।

রাগের সময় শাস্তি দিবে না

রাগ ও ক্রোধ যথাসম্ভব দমন করিয়া রাখিবে। রাগের সময় হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সুতরাং ঐ সময় কোন বিষয়ে ফায়সালা করিতে নাই। রাগের সময় মন উত্তেজিত থাকে এবং এই উত্তেজনার ক্ষতিকর দিকগুলি তখন সঠিকভাবে অনুভূত হয় না। অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে, রাগ ও ক্রোধ দমন করা সর্বদাই কল্যাণকর হইয়াছে এবং উহা অব্যাহত রাখার পরিণতি ক্ষতিকর হইয়াছে। রাগের সময় তাড়াহুড়া করিয়া কখনো কোন কাজ করিবে না। হাদীস শরীফেও রাগের সময় কোন ফায়সালা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং রাগের সময় কখনো বাচ্চাদেরকে প্রহার করিবে না। বরং রাগ পড়িয়া যাওয়ার পর ধীর-সুস্থিরে চিন্তা-ভাবনা করিয়া শাস্তি দিবে।

আমি নিজেও রাগের সময় কোন ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। রাগ পড়িয়া যাওয়ার পর অপরাধী শাস্তির উপযুক্ত কি-না উহা তিন-চারিবার চিন্তা না করিয়া তাহাকে শাস্তি দেই না।

একবার এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, অনেক সময় চাকর-নৌকরদেরকে মুখে কিংবা হাতে শাস্তি দেওয়ার সময় কিছুটা অতিরঞ্জনও হইয়া যায় এবং পরে উহার জন্য অনুশোচনা করিতে হয়। সুতরাং এমন কোন উপায় বলিয়া দিন যেন এই ক্ষেত্রে আমাদের দ্বারা কোন প্রকার বাড়াবাড়ি না হয়। আমি তাহাকে বলিলাম, উহার উত্তম উপায় হইল–

১। প্রথমেই চিন্তা করিয়া লইবে যে, চাকরকে শাসন করিতে আমি এই এই শব্দ ব্যবহার করিব এবং এই পরিমাণ শাস্তি দিব। অতঃপর এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে, যেন যাহা চিন্তা করা হইয়াছে উহার অতিরিক্ত কিছু করা না হয়।

২। এই ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হইল– রাগের সময় আদৌ কোন শাস্তি দিবে না। রাগ প্রশমিত হওয়ার পর চিন্তা করিবে, কি পরিমাণ শাস্তি তাহার প্রাপ্য। অতঃপর সেই অনুযায়ী শাস্তি দিবে– এই পন্থাই সকল দিক হইতে নিরাপদ। অন্যায়ভাবে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া বড় গোনাহ, কেয়ামতের দিন এই অন্যায়-শাস্তির বদলা গ্রহণ করা হইবে।

এক মহিলা একটি বিড়ালকে শাস্তি দিয়াছিল। মহিলার ইন্তেকালের পর রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিতে পাইলেন, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সেই বিড়ালটি তাহাকে আঁচড়াইতেছে। একটি বিড়ালকে শাস্তি দেওয়ার কারণে যদি জাহান্নামের আজাব ভোগ করিতে হয়, তবে (মানব) সন্তান তো ইনসান (বা (আশরাফুল মাখলুকাত, সুতরাং এই ক্ষেত্রে আরো কঠোর শাস্তি হওয়াই স্বাভাবিক)।

যদি অতিরিক্ত রাগ আসিয়া পড়ে তবে অপরাধীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে কিংবা তাহাকেই সরাইয়া দিবে এবং ঠাণ্ডা পানি পান করিবে। অতিরিক্ত রাগের সময় এইরূপ চিন্তা করিবে যে, আমার উপরও তো আল্লাহর হক আছে, অথচ আমার দ্বারা অহরহ ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতেছে। সুতরাং আল্লাহ যখন আমাকে ক্ষমা করিয়া দিতেছেন, তখন আমারও উচিত অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া। অন্যথায় আমার নিকট হইতে যদি প্রতিশোধ লইতে চাহেন, তখন আমার কি উপায় হইবে?

বাচ্চাদেরকে শাসন করার সময় কখনো যদি কোন অতিরঞ্জন ও সীমা লংঘন হইয়া যায় তখন উহার প্রতিকারের উপায় হইল– শাস্তি দেওয়ার কিছুক্ষণ পর তাহাকে আদর করিয়া দিবে এবং তাহার সঙ্গে সদয় আচরণ করিবে যেন সে

খুশী হইয়া যায়। যেমন–

মিরাঠের এক বিত্তবান ব্যক্তি কি কারণে তাহার চাকরকে একটি থাপ্পড় মারিয়াছিল। পরে সে নিজের অপরাধ টের পাওয়ার পর চাকরের মনোতুষ্টির জন্য তাহাকে একটি টাকা দিয়া দিল। ইহাতে সে এত খুশী হইয়াছিল যে, এই ঘটনার পর সে অন্যান্য চাকরদেরকে বলিল, আমি তো দোয়া করিতেছি যেন প্রতিদিন আমাকে একটি করিয়া থাপ্পড় মারা হয়।

অর্থাৎ শাসনের ক্ষেত্রে যদি কখনো কোন অতিরঞ্জন হইয়া যায় তবে উহার প্রতিকারের ইহাই উত্তম উপায়। ইহাতে বাচ্চাদের আখলাকের উপরও কোন খারাপ আছর পড়ে না এবং জুলুমেরও প্রতিকার হইয়া যায়।

অবাধ্য সন্তান

এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হযরত! অমুক ব্যক্তি আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি লইতেছিল। কিন্তু এমন সময় তাহার ছেলে কিছু টাকা-পয়সা লইয়া পালাইয়া যায, ফলে এই পেরেশানীর কারণে তাহার আর এদিকে আসা হয় নাই। আমি বলিলাম, ঐ ছেলে যদি বালেগ হয় তবে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। এই ধরনের আযোগ্য ও নালায়েক ছেলেদের অবস্থা অতিরিক্ত অঙ্গুলির মত, অর্থাৎ উহা রাখাও অস্বস্তিকর, আবার কাটিয়া ফেলাও কষ্টকর।

আমি একজন আলেমের অবস্থা দেখিয়াছি। তিনি একাধারে একজন আলেম এবং ডেপুটিকালেক্টরও ছিলেন। পেনশন লাভের পর তিনি ভাবিয়াছিলেন, এইবার নীরবে আল্লাহ, আল্লাহ করিয়া বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিবেন। কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা, তিনি জিকির-শোগল আরম্ভ করার পরই এক সঙ্গে তাহার দুইটি ছেলে পাগল হইয়া গেল। অতঃপর তিনি তাহার চিকিৎসার ব্যাপারে এমন পেরেশানীতে লিপ্ত হইলেন যে, অতঃপর আর নিয়মিত জিকির-শোগলে সময় দেওয়ার সুযোগ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু আল্লাহর আরেফগণ কখনো কোন বিষয়ে পেরেশান হন না এবং নিজের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট অবস্থা নির্ধারণ করিয়া লন না। আল্লাহ পাক যখন যেই হালাতে রাখেন সেই হালাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। আল্লাহ যখন সুযোগ দেন তখন নীরবে জিকির-শোগলে সময় কাটান, আর যখন উহার সুযোগ না থাকে

তখন যেই হালাতে রাখেন সেই হালাতেই রাজী থাকেন।

আমি তো বলি, আসল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। আল্লাহর এই সন্তুষ্টি অনেক সময় নীরব-নির্জনতায় হাসিল হয় আবার অনেক সময় সৃষ্টিজীবের খেদমতের মাধ্যমেও হাসিল হয়। সুতরাং পাগল সন্তানদের খেদমতের মাধ্যমে কি তিনি ছাওয়াব লাভ করিবেন না? অবশ্যই লাভ করিবেন। বরং এই পরিস্থিতিতে ফিকির ও পেরেশানীর মাধ্যমেই তাহার তরক্কি হাসিল হইবে। এই সময় বে-ফিকির ও নিশ্চিন্ত থাকা তাহার জন্য কল্যাণকর নহে। বরং এই সময় নীরবে বসিয়া আল্লাহর জিকির করার তুলনায় অসুস্থ সন্তানদের সেবা করিলেই অধিক ছাওয়াব হাসিল হইবে। সুতরাং বান্দার পক্ষে কোন হালাতেই পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নাই।

পেরেশানীর কারণ ও প্রতিকার

মানুষের পেরেশানীর মূল কারণ হইল তাহার নিজের সৃষ্ট 'ধারণা'। মানুষ নিজে নিজেই এইরূপ 'কাল্পনিক পোলাও' রান্না করিতে থাকে যে, আমার ছেলে দীর্ঘ জীবি হইবে, সে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া এত টাকা বেতন পাইবে এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করিয়া আমাদের সেবা-যত্ন করিবে ইত্যাদি। আমরা সকলেই এইরূপ দীর্ঘ পরিকল্পনার ব্যাধিতে লিপ্ত। পরে যখন বাস্তব অবস্থা আমাদের 'ধারণা' ও পরিকল্পনার খেলাফ হইতে থাকে তখনই আমরা পেরেশানীতে লিপ্ত হই। সুতরাং পূর্ব হইতেই যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে তবে আর পেরেশানীর শিকার হইতে হয় না। এই কারণেই আল্লাহওয়ালাগণ সর্বদা রাহাত ও শান্তিতে থাকেন। তাহাদের মনে কখনো কোন পরিকল্পনা থাকে না। আল্লাহ পাক যখন যেই হালাতে রাখেন সেই হালাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকেন, সুতরাং কখনো তাহারা কোন পেরেশানীর শিকার হন না।

অনেক সময় দেখা যায়, শত চেষ্টা-তদ্বির করিয়াও ছেলেদের তা'লীম-তরবিয়ত করা সম্ভব হয় না। একবার এক পত্র লেখক আমাকে জানাইল যে, আমার ছেলে একেবারেই বখাটে হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে আমি এই বিষয়ে অন্তহীন পেরেশানীতে আছি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উহার কোন উপায় বলিয়া দিন। জবাবে আমি লিখিলাম, কোন উপায় অবশ্যই অবলম্বন করিবে বটে, কিন্তু উহার উপর ফলাফলের আশা পোষণ করিবে না। তোমার পেরেশানী দূর হওয়ার ইহাই একমাত্র পথ। অর্থাৎ সাধ্যমত চেষ্টা-তদ্বির

অবশ্যই চালাইয়া যাইবে বটে, উহার উপর এইরূপ ধারণা করিবে না যে, আমার চেষ্টার ফলেই আমার ছেলের পরিপূর্ণ এছলাহ্ হইয়া যাইবে এবং আমার দিলের চাহিদা অনুযায়ী সে লেখাপড়া শিখিয়া আমার দিলের তামান্না পূরণ করিবে। এইরূপ চিন্তা ও পরিকল্পনা মন হইতে একেবারেই দূর করিয়া ফেলিবে।

আমি কোরআন-হাদীসের আলোকেই উপরোক্ত জবাব লিখিয়াছি। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিবর্জিত কোন ব্যক্তি হয়ত এইরূপ লিখিত যে, এই বিষয়ে তুমি একেবারেই চেষ্টা-তদ্বির বর্জন কর। কিন্তু ইহা সন্তান-বাৎসল্যতা ও স্নেহ-মমতার খেলাফ। তবে ফলাফল লাভের বিষয়টির মূল হাকীকত হইল— আল্লাহ পাকের সঙ্গে যখন অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে তখন এই ধরনের চিন্তা ও ফিকির নিজে নিজেই দূর হইতে থাকিবে। তবে এই কথা সত্য যে, নিজের সন্তান যখন বিপথগামী হইয়া যাইবে, তখন মানসিকভাবে কিছুটা পেরেশানী অবশ্যই আসিবে, তো আল্লাহ পাক এই পেরেশানীরও বিনিময় দান করিবেন।

বাচ্চাদের অন্যায়-আব্দার

বাচ্চারা যদি কোন বিষয়ে জিদ করে তবে কখনো উহা পূরণ করিতে নাই। মনে কর তোমার ছেলেরা যদি বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়া গোলা ছুঁড়িতে থাকে তবে কি তুমি তাহাদিগকে বাঁধা দিবে না? অবশ্যই বাধা দিবে। যদি তাহারা তোমার নিষেধ না মানে তবে মানিতে বাধ্য করিবে। অনুরূপভাবে এই ক্ষেত্রে কেন তাহাকে আদেশ মান্য করিতে বাধ্য করা হয় না?

তুমি নিজে যদি কোন অন্যায় ও মুসীবতকে খারাপ মনে কর, তবে বাচ্চাদেরকে কেন উহার অভ্যাস করিতে দাও? জিদ করিয়া তাহারা যদি সাপ চায় তবে কি তাহাদিগকে উহাই দিতে হইবে? সুতরাং আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সকল বিষয়কে ক্ষতির (ও গোনাহ) বলিয়াছেন, (বাচ্চারা জিদ করিলেই) কি কারণে উহার অভ্যাস করানো হইতেছে? সুতরাং দেখা যাইতেছে, আল্লাহ ও রাসূলের আজমত না থাকার কারণেই এই সকল বিষয়ে অবহেলা ও ত্রুটি করা হইতেছে।

আতশবাজীর জন্য বাচ্চাদেরকে পয়সা দেওয়া হারাম। এই কাজে পয়সা দেওয়ার তোমার কোন অধিকার নাই। তোমার নিকট রক্ষিত সমুদয় সম্পদের

মালিক আল্লাহ। তোমাকে কেবল উহার রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, নিজের খেয়াল-খুশি মত খরচ করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তোমার নিকট রক্ষিত আল্লাহর মাল তুমি কোন কাজে ব্যয় করিয়াছ, কেয়ামতের দিন এই বিষয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সুতরাং বাচ্চাদেরকে আতশবাজী এবং অন্যান্য নাজায়েজ কাজের জন্য কখনো পয়সা দিবে না। যদি অন্যায়ভাবে জিদ করে তবে শাসন করিবে। না জায়েজ খেল-তামাশার নিকট কখনো দাঁড়াইতে দিবে না।

একটি বাচ্চা স্বীয় পিতামাতার নিকট বায়না ধরিল যে, আমাকে অমুক বস্তুটি আনিয়া দিতে হইবে। পিতামাতা সন্তানের মন রক্ষার্থে উহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে আবার জিদ করিয়া বসিল যে, আমাকে অমুক খাবার বস্তু আনিয়া দিতে হইবে, এইবারও তাহার আবেদন পূরণ করা হইল। এইভাবে একে একে তাহার যাবতীয় জিদ পূরণ করার পর সে বলিতে লাগিল, ঐ আকাশের চাঁদ কেন উদিত হয়? উহাকে ঢাকিয়া ফেলা হউক। এইবার পিতামাতা অপারগ হইয়া বাচ্চার মুখে চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে খামুশ করিয়া দিলেন, (কিন্তু শুরু হইতেই যদি বাচ্চাকে প্রশ্রয় দেওয়া না হইত, তবে সে এমন অন্যায়-আব্দার করার দুঃসাহস করিতে পারিত না)।

একটি ঘটনা

ভাইসকল! আল্লাহর ওলীগণ নিজেদের সন্তানদেরকে এমন এমন অভ্যাস করাইতেন যে, উহার ফলে তাহারা অমূল্য সম্পদ লাভ করিতেন। পক্ষান্তরে তোমরা তাহাদের দ্বারা এমন অভ্যাস করাইতেছ যে, উহার ফলে দুনিয়া ও আখেরাত সবই বরবাদ হইতেছে।

এক বুজুর্গের কম বয়সী একটি শিশু-সন্তান ছিল। শুরু হইতেই তিনি স্ত্রীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সে কিছু চাহিলে উহা নিজের হাতে দিবে না। বরং তাহার প্রয়োজনের জিনিসটি নির্দিষ্ট কোন জায়গায় লুকাইয়া রাখিবে এবং সে যখন চাহিবে তখন তাহাকে বলিবে তুমি অমুক জায়গায় গিয়া আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। অতঃপর সেখানে হাত বাড়াইলেই উহা প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ অভ্যাস করাইতে পারিলে তাহার শিশু-মনেই এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবে যে, আল্লাহ পাকই সকল কিছু দান করেন।

একদিন তাহার মাতা যথাস্থানে তাহার খাবার রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন,

কিন্তু শিশুটি অভ্যাস অনুযায়ী যথাসময় সেখানে গিয়া তাহার খাবার প্রার্থনা করিয়া হাত বাড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক গায়েব হইতে তাহার খাবারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ঘটনা শুনিয়া সেই বুজুর্গ বলিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমি এই দিনেরই অপেক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর সারা জীবন তাহার সন্তানের এই অবস্থা ছিল যে, যখনই তাহার কোন জিনিসের প্রয়োজন হইত, তখনই সে আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করিয়া উহা প্রাপ্ত হইত। অর্থাৎ শৈশবেই তিনি নিজের সন্তানকে আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ বানাইয়া দিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, আমরা এতটা না পারিলেও অন্ততঃ নিজেদের সন্তানদেরকে গোনাহের কাজ হইতে তো বিরত রাখিতে পারিব।

অতিরিক্ত স্নেহ ঠিক নহে

বাচ্চাদের অতিরিক্ত স্নেহ করার ফলে অনেক সময় তাহারা নিজের জন্য মুসীবতের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আমি এক বাদশার বেটীকে দেখিয়াছি, তিনি নিজের সন্তানাদিকে এত অধিক মোহাব্বত করিতেন যে, রাতে তাহাদেরকে পৃথক রাখিয়া ঘুমাইতে পারিতেন না। পরে যখন বাচ্চাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল এবং এক পালঙ্কে সকলের সংকুলান কষ্টকর হইয়া পড়িল তখন তিনি পালঙ্ক ত্যাগ করিয়া সকলকে লইয়া মাটিতে ঢালাও বিছানা পাতিয়া শয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইভাবেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, শয়নের সময় একজনের উপর হাত রাখিয়া এবং একজনের উপর পা রাখিয়া সকলকে আগলাইয়া রাখার প্রয়াস চালাইতেন। ঘুমের ফাকে ফাকে বার বার চোখ খুলিয়া দেখিয়া লইতেন সকলে ছহী ছালামতে আছে কি-না।

এক্ষণে বলুন, এই ধরনের মোহাব্বত কি আজাব ও মুসীবতের কারণ নহে? আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত শান্তিতে আছেন যিনি মাত্র একজনকে ভালবাসিয়াছেন, সেই একজন হইলেন আল্লাহ।

পুরুষদের দায়িত্ব

আমাদের পারিবারিক জীবনের দুরবস্থার অন্যতম কারণ হইল আমরা নারীদের হাতে ঘরের সকল কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়াছি। এই কর্তৃত্ব ছোট হইলেও উহার পরিণতি কিন্তু খুবই খারাপ। পরিবারের বিবাহ-শাদীর যাবতীয় নিয়ম-রুসম নারীদের ইচ্ছামতই সম্পাদন করা হয়। উহার ভয়াবহ পরিণতিতে কত ভাল ভাল পরিবার ধ্বংস হইতেছে তাহা সর্বজন বিদিত। নারীদেরকে গৃহের কর্ত্রী বানানোর কারণেই বর্তমানে এই সকল অনিষ্ট দেখা দিতেছে। ঘরের নারীদেরকেও খুশী রাখা জরুরী বটে, কিন্তু তাহাদের অনুগত হওয়া ক্ষতিকর।

বর্তমানে আমরা ছেলেমেয়ে ও টাকা-পয়সা ইত্যাদি সবই নারীদের কর্তৃত্বে ছাড়িয়া দিয়াছি। ফলে এক দিকে আমাদের উপার্জিত অর্থ যথেচ্ছা ব্যয় হইতেছে, অন্যদিকে ছেলেমেয়েদের স্বভাব-স্বাস্থ্য সবই নষ্ট হইতেছে। অতিরিক্ত আদর-স্নেহের ফলে বাচ্চারা উশৃংখল হইয়া পড়িতেছে। এই কারণেই টাকা-পয়সা ও সংসারের যাবতীয় বিষয়-সম্পদ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা বাঞ্ছনীয়। এই সকল বিষয়ে নারীদের কর্তৃত্ব দেওয়াই অধপতনের মূল কারণ। এই বিষয়ে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ হইলঃ যেই জাতির নেতৃত্ব দিবে নারী, সেই জাতি কখনো সফলকাম হইতে পারিবে না।

শিশুদের চঞ্চলতা ঃ একটি ঘটনা

শিশুদের চঞ্চলতা ও বিশৃংখল স্বভাব আদব-তমীজের খেলাফ নহে। কারণ চঞ্চলতাই তাহাদের বয়সের দাবী। বয়োবৃদ্ধ বাপ-দাদাদের মত গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকা তাহাদের কাজ নহে।

হযরত মারজা মাজহার জান্‌জানা (রহঃ) একবার নিজের এক মুরীদকে বলিলেন, তোমার বাচ্চাকে একবারও আনিয়া দেখাইলে না? হযরত মারজা যখনই এই অনুযোগ করিতেন বেচারা মুরীদ সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন ওজর-বাহানা দেখাইয়া দিত। কারণ মুরীদের মনে এমন আশঙ্কা ছিল যে, হযরত মারজা ছাহেব বড় নাজুক তবিয়তের মানুষ, আর বাচ্চারা সাধারণত উশৃংখল স্বভাবের হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাকে এখানে লইয়া আসিলে এমন না হয় যে, তাহার কোন অসঙ্গত আচরণে হযরত মারজা ছাহেব মনে কষ্ট পান।

কিন্তু তিনি যখন এই বিষয়ে বার বার অনুযোগ করিতে লাগিলেন তখন মুরীদ কয়েকদিন পর বাচ্চাকে আনিয়া হযরতের দরবারে হাজির করিল। আর ইতিমধ্যেই সে বাচ্চাকে খুব ভালভাবে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, হযরতের দরবারে গিয়া একেবারে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকিবে এবং চোখ তুলিয়া এদিক সেদিক তাকাইবে না।

শিশুটিও পিতার কথা মত ছালাম করিয়া একেবারে মূর্তির মত নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। কোন দিকে চোখ তুলিয়াও তাকাইল না এবং মুখ হইতে একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না। পরে মারজা ছাহেব নিজে তাহাকে কথা বলাইতে চাহিলেন কিন্তু পারিলেন না। এইবার তিনি মুরীদকে বলিলেন, তুমি তো আজও তোমার ছেলেকে লইয়া আসিলে না?

মুরীদ সবিনয়ে আরজ করিল, হযরত! এই তো আমার বাচ্চা বসিয়া আছে। হযরত ফরমাইলেন, ইহাই কি তোমার বাচ্চা? ইহাকে তো তোমার পিতা বলিয়া মনে হইতেছে। বাচ্চারা তো চঞ্চলতার সহিত লাফালাফি ও খেলা-ধুলা করে, মাথার টুপি কাড়িয়া লয়, কখনো বক্ষের উপরে আসিয়া বসে ইত্যাদি। আর এই বাচ্চা তো তোমার বাপ বনিয়া বসিয়া আছে।

সমাপ্ত